পাপ পুণ্য

জন্মসিদ্ধ ঠাকুর শ্রীশ্রীবালক ব্রহ্মচারী মহারাজের বেদতত্ত্ব আলোচনা ও ভাষণ সংকলন।।

অভিনব দর্শন

রাম নারায়ণ রাম
সমগ্র পরিকল্পনা, সংকলক, সংগ্রাহক ও প্রকাশক ঃ-
শ্রী চপল মিত্র

সংকলনে সহযোগিতায় ঃ-
ডঃ সুজাতা গঙ্গোপাধ্যায় ও হেনা মিত্র

প্রথম প্রকাশ ঃ-
শুভ ১লা বৈশাখ, ১৪১৮
১৫ই এপ্রিল, ২০১১

মুদ্রণ
মেসার্স এম. দত্ত
১১, ওল্ড পোষ্ট অফিস ষ্ট্রীট
কোলকাতা - ৭০০০০১

চিঠিপত্র ও বই সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয় যোগাযোগ ঃ-
"অভিনব দর্শন"
স্বপ্ননীড় অ্যাপার্টমেন্ট, ৪নং পল্লীশ্রী, ২৯১ এস. কে. দেব রোড
পোঃ- শ্রীভূমি, পি.এস.- লেকটাউন, কোলকাতা-৪৮, ফোন - ২৫২১-৫১৯৬
মোবাইল - ৯২৩১৮-৯২০৮৫, ৯৪৩২৩-৭২০৭২
Email : bbt_sukchar@yahoo.co.in
infoavinabadarshan@gmail.com
Website : www.avinabadarshan.com (Free Site)

প্রাপ্তিস্থান ঃ-
১) ব্রহ্মচারী ধাম সুখচর, উত্তর ২৪ পরগণা, কোলকাতা - ৭০০১১৫
২) ১৯৭, লেক টাউন, ব্লক-বি, কোলকাতা-৮৯, ফোন - ২৫২১-৫১৪৬

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

পূর্বাভাষ

এই অনন্ত জীবনে চলার পথে আমরা জ্ঞাতে অজ্ঞাতে এমন অনেক কাজ করি, যার পরিণাম (ফলাফল) স্বরূপ, কোন্‌টা ভাল, কোন্‌টা মন্দ, কোন্‌টা ন্যায়, কোন্‌টা অন্যায়, কোন্‌টা পাপ, কোন্‌টা পুণ্য সাধারণ দৃষ্টিতে ঠিক বুঝে উঠতে পারি না। আমরা মুক্তির পথ খুঁজতে গিয়ে পাপ আর পুণ্য হাতড়াথে হাতড়াতে চলেছি। জীবনযাত্রার মাঝে যেভাবে আমরা সংস্কারের বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে পড়েছি, তাতে প্রতি পদক্ষেপে পাপ আর পুণ্য বিরাট বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কোন কাজ করার সঙ্গে সঙ্গে যদি বোঝা যেত পাপ আর পুণ্য কর্মের ফলাফল, তবে কোন অসুবিধে হতো না। মানুষ যদি বুঝতো, এখানে স্বর্গ, ঐখানে নরক, তাহলেই সব সমাধান হয়ে যেত। কারও উপদেশ দেবার প্রয়োজন হতো না।

আমাদের জীবনে বহু ঘটনা আসে, অনেক ঘটনা ঘটে, তা চিরকাল থাকে না। যদি থাকতো, তবে কেউ আর কিছু করতে পারতো না। যদি আকাশের মেঘগুলি সূর্যকে সারাক্ষণ ঢেকে রাখতো, তাহলে সূর্যের মুখ আর আমরা দেখতে পারতাম না। মেঘ সূর্যকে আড়াল করে ব'লে, মেঘ সূর্য হতে বড়, তা কখনও হতে পারে না। মেঘ সূর্যেরই সৃষ্টি। মেঘ না থাকলে এত সুন্দর সৃষ্টি হতে পারতো না। আমাদের মধ্যে পাপ পঙ্কিলতা, এটা আমাদেরই সৃষ্টি। সৃষ্টির মূলেই ক্লেদ। সৃষ্টির মূলেই অসার। এই অসার থেকেই আবার সারের উৎপত্তি। আজ আমরা সংস্কারের পিঞ্জরে আবদ্ধ হয়ে পড়েছি। পাখীকে খাঁচায় রেখে দিলে, তার ডানা ভারী হয়ে যায়। পরে ছেড়ে দিলেও সে আর উড়তে পারে না। আমরাও তেমনি সংস্কারের বেড়াজালে এমনই আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছি যে সমাজের ভয়ে আমরা আজ মুক্তভাবে, মুক্তমনে মুক্তাকাশে বিচরণ করতে পারছি না।

স্রষ্টা যদি স্বয়ং ভগবান হন, তবে তিনি কখনও পাপ-পুণ্য বিচার করবেন না। এই অনন্ত কোটি জীবের মাঝে কোন জীব কখনও পাপী হয়ে জন্মায় না। এখানে পাপের যে ব্যাখ্যা, তা পণ্ডিতদের তৈরী ছাড়া আর কিছু নয়। তৎকালীন সমাজে শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য বিচক্ষণেরা, সমাজ-সংস্কারকরা, এ সমস্ত আখ্যা ব্যাখ্যা তৈরী করেছেন। প্রকৃতির নিয়ম নীতি লক্ষ্য করলে দেখা যায়, অন্যায় করলে, পাপ করলে কঠোর শাস্তি অপেক্ষা করছে প্রত্যেকের জন্য। প্রকৃতির নিয়মে ত্রুটি ত্রুটিই। ছোট ছোট ত্রুটি একত্রিত হয়েই হয় বৃহৎ ত্রুটি। তাই প্রকৃতির ন্যায়ের দণ্ড হতে কেহই রেহাই পেতে পারে না। অপরাধের সাজার হাত থেকে কারও মুক্তি নেই।

আমরা শাস্ত্রের নানা ব্যাখ্যা আর টীকা, ভায্যের গোলক ধাঁধাঁয় ঘুরে মরছি। আজও কোন শাস্ত্রজ্ঞ বা সাধু, গুরু, মহান, অবতার সঠিক পথের সন্ধান দিতে পারলেন না। পাপ-পুণ্যের দোহাই দিয়ে বেশীরভাগ সাধু, গুরু সমাজকে পঙ্গু করে দিয়েছে, আতঙ্কগ্রস্ত করে তুলেছে। যাহা সত্য, তাহা সকলের জন্য সত্য। একজন মুক্তিলাভ করবে, আর অন্য কেহ পারবে না, তা কখনও হতে পারে না। কারণ সকল জীবই মুক্ত অবস্থাতে সৃষ্ট। বিশ্বস্রষ্টার সকল আদিভাব নিয়েই জীবের সৃষ্টি। তাই কেহ পাপী নয়; কেহ অভিশপ্ত নয়।

মিথ্যা কথা বলা মহাপাপ, হিংসা করা মহাপাপ, জীবহত্যা মহাপাপ। এসব যদি পাপ হয়ে থাকে, তবে কোন জীবের কোন কালে মুক্তি হতে পারে না। প্রকৃতির নিয়মে জীব প্রতি মুহূর্ত্তে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। প্রত্যেকে প্রত্যেককে খেয়ে বেঁচে আছে। বর্ত্তমান সমাজে প্রচলিত তথাকথিত সংস্কারগত যে সব সাধু গুরু মহান অবতার শাস্ত্র প্রচার করছেন, শাস্ত্র ব্যাখ্যা করছেন, তারাও এইসব খেয়ে বেঁচে আছেন; শ্বাসে প্রশ্বাসে কত জীব ধ্বংস করছেন। তাঁদের যদি সিদ্ধিমুক্তি লাভ হয়ে থাকে, তাহলে আমাদেরও সিদ্ধিমুক্তি হতে বাধ্য। কারণ যেটা সত্য, সেটা সবসময় সকলের জন্যই সত্য। মনের গভীরে মনের অগোচরে দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, সন্দেহ না রেখে, স্বচ্ছ মনে স্বচ্ছ চিন্তায় যা-ই করা যায়, তা সত্যিকারের সত্য হয়ে দাঁড়ায়। কোন কাজে অপরাধ হয় না, যদি স্বচ্ছ মনেতে কাজটা করা যায়। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রতিটি কাজের পিছনে আমাদের একরকমের দ্বিধা, সন্দেহ তাড়া করে চলে। অপরাধ ও পতন হয়, ঐ দ্বিধা, সন্দেহ আর অবিশ্বাসের ফলে।

কোন্‌টা ন্যায়, কোন্‌টা অন্যায়—তার কোন সঠিক সংজ্ঞা খুঁজে পাওয়া যায় না। ন্যায়-অন্যায় বোধ ন্যস্ত রয়েছে যার যার বুদ্ধি বৃত্তির উপরে। প্রকৃতি তাঁর নিয়মে সকল জীবকে সজাগ রাখার জন্য 'বিবেক' বলে একটি বস্তু দান (gift) করেছেন। সেই বিবেক বা সজাগ প্রতি মুহূর্ত্তে কোন্‌টা ন্যায়, কোন্‌টা অন্যায়, সকলকে তা জানিয়ে দিচ্ছেন। সুতরাং এখানে ন্যায়-অন্যায়, পাপ-পুণ্য বলে কোন কথা নয়। আমাদের বিবেক অর্থাৎ সজাগের সাড়ায় কাজ করে যেতে হবে। বিবেকই জানিয়ে দেবে কোন্‌টা পাপ, কোন্‌টা পুণ্য; কোন্‌টা ন্যায়, কোন্‌টা অন্যায়। এরজন্য মন্দির, মসজিদ, গীর্জায় গিয়ে মাথা ঠুকতে হবে না। কোন তাবিচ, কবচ ধারণ করতে হবে না। কোন যাগযঞ্জ, শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করতে হবে না। যার যার নিজ নিজ দেহক্ষেত্রে মনন করে খনন করলে, তবেই পাওয়া যাবে পরম পথের সন্ধান। তখনই জীব বুঝতে পারবে, কোন্‌টা পাপ, কোন্‌টা পুণ্য।

যুগ যুগ ধরে চলে আসা শাস্ত্রের কচকচানি, আর সংস্কারের বেড়াজালে আচ্ছন্ন হয়ে মানুষ আজ পাপ-পুণ্য, ন্যায় অন্যায়ের সম্যক্ ধারণা করতে পারছে না। ফলে তথাকথিত শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত সাধু, গুরু মহানদের কবলে পড়ে তারা দিশেহারা হয়ে পড়েছে। এই দিশেহারা অবস্থা থেকে মানুষকে সঠিক পথের সন্ধান দিতে, জন্মসিদ্ধ ঠাকুর শ্রীশ্রীবালক ব্রহ্মচারী মহারাজ কোন্‌টা পাপ, কোন্‌টা পুণ্য, কোন্‌টা ন্যায়, কোন্‌টা অন্যায় সে সম্বন্ধে কখনও ঘরোয়া পরিবেশে, কখনও বিভিন্ন জনসভায় ও বেদের সভায় অমৃতময় বেদতত্ত্ব পরিবেশন করেছেন। সেই সকল অমৃতময় বেদতত্ত্ব ছোট ছোট পুস্তিকা আকারে প্রকাশের গুরুদায়িত্ব তাঁরই প্রতিষ্ঠিত **'অভিনব দর্শন'** প্রকাশনের উপর তিনি অর্পণ করেছেন। তাঁর ইচ্ছা ও নির্দেশকে শিরোধার্য করে, অভিনব দর্শন প্রকাশনের ৩৬-তম শ্রদ্ধার্ঘ প্রকাশিত হলো **'পাপ পুণ্য'**।

শুভ নববর্ষ, ১৪১৮ — *চপল মিত্র*

১৫ই এপ্রিল, ২০১১ — *(সংকলক, সংগ্রাহক ও প্রকাশক)*

অন্যায় করলে অনুতাপ হবেই। বিবেক কখনো তোমার সাথে Compromise করবে না

সুখচর ধাম
১৫ই জুন, ১৯৮৫

এই বিশ্বজগৎ অনুপরমাণুরই খেলা। এই অণুপরমাণুর মধ্যেই মনপ্রাণ ডুবিয়ে দিয়ে ডুবুরীর মত তার তত্ত্ব খুঁজতে হবে। বস্তুর বস্তুত্বের অস্তিত্বকে স্বীকার করে নিয়ে, জানার পথে জানতে জানতে এগিয়ে যেতে হবে। এই যাওয়াটাই হচ্ছে সাধনা। **সাধনা শুধু ফোঁটা কাটা, তিলক কাটা, আচার অনুষ্ঠান নয়। সাধনা শুধু জপ তপ, পূজা অর্চনাও নয়। একাগ্রতাই সাধনা।** যে কোন বিষয়ের মধ্যে একাগ্রভাবে মনোনিবেশ করা বা মনন করাকেই সাধনা বলে। বেদ সেই সাধনার কথাই বলে।

প্রতিটি মানুষের মাঝে জ্ঞান, বিচার, বিবেক, চৈতন্য আছে; বুঝের বীজ আছে। এই বীজটার থেকে গাছ হ'য়ে ফুলে ফলে ভরপুর হয়েছে কি না, সেটা দেখতে হবে। তার জন্যই সাধনার প্রয়োজন। বীজটা যদি কৌটার মধ্যে রেখে দাও, সে বীজ সেখানেই রইলো, সেখানেই শুকালো। সেখানেই শেষ হয়ে গেল। বীজটার শক্তি কিন্তু ঐ বীজটায় পুঞ্জীভূত রয়েছে (সঞ্চিত রয়েছে)। বুঝতে পেরেছ? যে বীজটা কৌটায় রাখলে ঐ বীজটার মধ্যে গাছ হওয়ার ক্ষমতাটা কিন্তু রয়ে গেল। বুঝেছ? সেই বীজটা কৌটা থেকে নিয়ে যদি মাটিতে পুঁতে দেওয়া হয়, যত্ন করা হয়,

তখন তার থেকে আবার তার স্বরূপটা বের হতে আরম্ভ করবে। স্বরূপটা বের হবে না?

এই জীবজগতে যত সৃষ্টি, যা সৃষ্টি দেখতে পাচ্ছ, মশা মাছি, পিঁপড়া থেকে শুরু করে অতিকায় (প্রকাণ্ড) জীব, প্রত্যেকের ভিতরেই প্রকৃতির অনন্ত শক্তি নিহিত আছে। প্রতিটি জীব প্রকৃতির ভাণ্ডার হতে সেই বীজ ভাণ্ডারের শক্তি, সেই বীজশক্তিকে নিয়ে জন্ম নিয়েছে। তবে হচ্ছে না কেন? জাগছে না কেন? মনের মাঝে অনন্ত জিজ্ঞাসা। আমি বলবো, জাগছেও, হচ্ছেও। কি করে? সেটা কি করে বুঝবো? যখনই তুমি জিজ্ঞাসা করছো, ' কেন হচ্ছে না? কেন বুঝতেছি না'— এই বুঝটা তো তোমার ঠিক আছে, এ্যাঁ? যখনই বলছো, 'আমার হচ্ছে না, আমি বুঝতে পারছি না। মনটা বড্ড চঞ্চল। শুধু এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ায়। কিছুতেই আয়ত্তে আনতে পারছি না। ফাঁক পেলেই ছ্যাঁৎ ছ্যাঁৎ করে কোন্‌দিকে চলে যায়। কিছুতেই ধরে রাখতে পারছি না।' এতগুলি কথা তুমি আমাকে বললে।

আমি বললাম, very good. তুমি বুঝতে পারছো? এরকম যে হচ্ছে তোমার ভিতরে, এগুলি তো তুমি বুঝতে পারছো? কি, এ্যাঁ? যখনই তুমি এগুলি বুঝতে পারছো, তখনই তোমার বুঝা উচিত যে, 'তোমার যন্ত্রে সাড়া দিয়েছে।' মানুষ একটা বিকল যন্ত্রকে যদি ঠিক করতে যায়, যন্ত্র হাতাতে হাতাতে যন্ত্রের defect টা সে যদি বুঝে নিতে পারে যে, এইটার এই জায়গায় defect, সেইটাই তো বড় কথা। আমি তো আগে defect টা বের করতে চাই। **কোন্ জায়গায় গল্‌তিটা জানতে পারলেই তো অনেকটা কাজ হয়ে গেল। Instrument-টা বাজছে না কেন? সুর দিচ্ছে না কেন? Defect-টা যদি বুঝে**

নিতে পার, তাহলেই তো যথেষ্ট হয়ে গেল। সেই তো বিচক্ষণ, যে defect-টা বের করতে পারে বা সর্বশাস্ত্রে, সর্বজায়গায় যে গল্‌তিটা বের করতে পারে।

অসুখটা হ'ল কেন? কি অসুখ? অসুখের কারণটা কি? সেটা যদি বুঝে নিতে পারে, চিকিৎসা করতে খুব বেশী অসুবিধা হয় না। প্রতি জায়গায় প্রতিক্ষেত্রে একই অবস্থা। শিক্ষকদেরও বুঝতে হবে একই কথা। ছাত্র কেন পড়ছে না? কেন মনোযোগ আসছে না? কেন মুখস্থ করতে পারছে না? সেই কারণটা যদি সে বুঝে নিতে পারে, তবে সেই ছাত্রকে পড়াতে মাষ্টারের কোন অসুবিধা হয় না। বুঝতে পেরেছ?

সেরকম প্রকৃতির ভাণ্ডার থেকে কতো ক্ষমতা নিয়ে এই জীবজগৎ এসেছে এই মৃন্ময় পৃথিবীতে। কিন্তু প্রত্যেকের মুখে একই কথা, 'মনটা চঞ্চল। বড্ড ব্যতিব্যস্ত করছে।' কিসে কিসে তোমাদের ব্যতিব্যস্ত করছে? কোন্ কোন্ ধারায় তোমাদের মনটা এগিয়ে যাচ্ছে? কোন্ কোন্ ধারাবাহিকতায়, কোন্ কোন্ chanel (চ্যানেল) দিয়ে তোমাদের মনটা যাচ্ছে দেখ এবং এই chanel-গুলো যে তোমাদের ভিতরেই রয়েছে, সেটা বোঝ। জলটা পাত্রে থাকলে তো সেই পাত্রেই রইলো। ঢাল (ঢালু জায়গা) থাকলে সেখান দিয়েই যায়। তোমাদের মনে এমন কিছু ঢাল দিয়ে দিয়েছে; এমন কিছু ঢালের ব্যবস্থা আছে মনের মধ্যে, যেই ঢাল দিয়ে গড়গড়িয়ে চলছে সব। প্রাকৃতিক নিয়মেই তোমাদের মধ্যে সেটা রয়েছে। এমন ঢাল (মনের টান), যার মাধ্যমে সহজে তোমাদের মন যেতে পারে। তা নাহলে তোমরা তো যাবে না।

অন্যের বাচ্চা দৌড়ায়, তুমি দেখতেছ। তোমার বাচ্চা

যখন দৌড়ায়, তুমি দৌড়ে গেছ। কথাটা বুঝতে পেরেছ? অন্যের বাচ্চা যখন দৌড়ে যায়, তুমি দেখছো। আর তোমার বাচ্চা যখন দৌড়াদৌড়ি করে, রেলিং-এর কাছে যায়, তুমি তাড়াতাড়ি দৌড়ে গিয়ে ধরছো। বুঝতে পেরেছো? তাহলে তোমার ঢাল— তোমার ঘরের মধ্যে, তোমার পেটে। ঢাল (মনের টান) আছে বলেই দৌড়াদৌড়ি করছো। আবার অন্যের পেটের বাচ্চা যখন রেলিং-এর কাছে যায়, তখনও ঢাল আছে, তবে অতটা অন্তরঢালা নয়— ৬ আনা, ৪ আনা হয়ে যায়। কমে যায়, অনেক কমে যায়। হয় না এটা? একরকম দরদ থাকে? কমে যায়। ক্রমশঃই কমে যায়। দেখ না, নর্দমা ঢালু থাকলে জল কেমন হড়হড় করে চলে যায়। আর উঁচু করা থাকলে বাধা পেয়ে জল ছিটকে যায়।

তোমাদের জীবনযাত্রার পথেও ঢালটা দেখতে হবে। কার ঢাল কতটা, কোন্দিকে আছে? দেখা যায়, প্রাকৃতিক নিয়মে নিজস্বভাবে প্রত্যেকের কতগুলো ঢাল একধরণের। যার যার রক্তের, নিজের পেটের বাচ্চা একধরণের ঢাল। ভাইর বেটা, ভাগ্নে, ঢালের তারতম্য হচ্ছে। আত্মীয়স্বজনের বাচ্চা, ঢালের (মনের টানের) তারতম্য হচ্ছে। তারতম্য হইয়া যাইতেছে, বুঝলে? মুখে বলতে (স্বীকার করতে) অসুবিধা হয়। মুখে বলে, 'না, ঢালতো থাকেই।'

ঢাল থাকবে, সবটায় ঢাল থাকবে। তবে ঢালের মাত্রাটা বেশীকম দেখা যায়। কার্যক্ষেত্রে তোমরা সেটা আরও বেশী বুঝতে পারবে, এবার যখন আরও একটু বুঝে গেলে। ব্যাবহারিক ক্ষেত্রে মাত্রাটা যে কতটা বেশী কম ভালমতই বুঝতে পারবে। কিন্তু মুখে বলতে গেলে অসুবিধা হয়ে যাবে। মুখে যদি

কাউকে জিজ্ঞাসা করা হয়, তাহলে বলে, 'হ্যাঁ, ভাইর বেটা, নিজের ছেলের চেয়ে কম কি?'

কম কি? কম নয়। তবে একেবারে এক হয় না। বলতে পারো না যে, 'একেবারে এক।'

—'একেবারে এক' কি হতে পারে?

—না।

ঠিক বলেছ। তাহলে তোমাদের ঘরের মধ্যে চিন্তা করে দেখ। যে বিড়ালটা তুমি পুষতাছ (পুষছো), যে কুকুরটা তুমি পুষতাছ, তারজন্য যে মায়া, অন্যের কুকুরের জন্য ততটা মায়া থাকবে না। কিছুই থাকবে না। কুকুর, বিড়াল থেকে আরম্ভ করে যা কিছু— প্রতি ক্ষেত্রেই মাত্রার তারতম্য আছে। নিজের পেটের বাচ্চার জন্য সেইভাবেই সাড়া দেওয়া আছে। এই যে মায়া বা আকর্ষণ— এটা আকর্ষণ তো? এখানে নাম দিয়েছে মায়া। এই **মায়া বা আকর্ষণ যে তোমাদের ভিতরে আছে, এটা Natural gift — প্রকৃতির সহজাত দান।**

আর কি আছে? আর কোন্ কোন্ দিকে ঢাল আছে? সহজে কোন্দিকে দৌড়াও বেশী? তোমাদের ভিতরে যে বুঝটা আছে, তাতেই বুঝে বুঝে চলছো বেশী। ক্ষুধা আছে, ক্ষুধার তাড়ণায় ছুটছো। চোখ আছে, দেখবার আকাঙক্ষায় চলছো। জিহ্বা আছে, স্বাদের আকাঙক্ষায় ছুটছো। সব ঢাল কিন্তু, গড়গড়িয়ে চলছে। শ্রবণেন্দ্রিয় (কান) যাদের আছে, তারা শোনার আকাঙক্ষায় চলছে। গান শুনছো, মেঘের গর্জন শুনছো। সবকিছুই শোনার জন্য ছুটে চলছো। ঘ্রাণেন্দ্রিয় (নাসিকা) আছে,

সুবাস যেটা, ঘ্রাণের মাধ্যমে গ্রহণ করার জন্য তোমরা ছুটছো। আবার দুর্গন্ধ যাতে না আসে, তারজন্য নাকে কাপড় দিচ্ছ। দেখা যাচ্ছে, নাকে কাপড় দেবার ব্যবস্থাও আছে। অতিরিক্ত শব্দ যেখানে হয়, তাড়াতাড়ি কান বন্ধ করি। কারণ অত শব্দের প্রয়োজন নাই। তারপরে চলছে তোমাদের শিক্ষার ব্যবস্থা। 'ভাল করে লেখাপড়া শিখি। নাম করি,' এই চিন্তায় অনেকে মোহের টানে চলছে। আবার অনেকে ভাবে, 'আমি যেভাবেই হোক, নাম করার চেষ্টা করবো, যাতে যশ হয়, তার চেষ্টা করবো,'— ঢাল চলছে।

তারপরে আসলো প্রেম। চললো প্রেমের ঢাল। দেখতে হবে, এই যে এতগুলো ঢাল আছে তোমাদের ভিতরে, কোন্ ঢাল কার উপরে কতটা effect করছে? ক্ষুধায় মানুষ চুরি করছে, ডাকাতি করছে। ক্ষুধা বলতে শুধু তোমার ক্ষুধা না। তোমার সংসারের ক্ষুধা, সবার ক্ষুধা মিটাতে চাইছো। তারজন্য কোন অন্যায় করতে দ্বিধা করছো না। তাতে কি হচ্ছে? যেগুলো আইনে ন্যায়-অন্যায় বলে বলছে, সেই ন্যায়ের থেকে সরে পড়তে হচ্ছে। বেশীরভাগই ত্রুটিমূলক কাজ করতে হচ্ছে। ত্রুটিমূলক কাজ করে ত্রুটিটা যদি মনে আসে, তাহলে আরও ত্রুটি হয়ে গেল। বিবেক তোমাকে guard দেবে। তার কাছে একটা testing metre আছে। বিবেকের ঐ testing metre সর্বদাই সাড়া দিয়ে চলেছে— হয় জ্বলে উঠছে। না হয়, নিভে গেছে। যখনই তুমি যে কাজ করতে যাচ্ছ, তারমধ্যে যদি লুকোচুরি থাকে, তুমি বুঝতে পারছো, 'হায় হায়, আমার মিটার তো জ্বলে উঠেছে; কাজটা সুবিধার না। এটা তো করা উচিত না।'

তাহলে বুঝা গেল, বিবেকের কাছে guidence টা পাচ্ছ,

advise টা পাচ্ছ যে, 'এটা করা উচিত না। জিনিসটাতো সুন্দর নয়। ওর সাথে যাওয়া উচিত না। 'ও' যাক খারাপ হয়ে।' তুমি এটা বুঝতে পারছো। কিন্তু পরিস্থিতির চাপে তবু করতে হবে। তাহলে দেখা গেল, **যখন ত্রুটি করতে যাচ্ছ, তখন ত্রুটিকে স্বীকার করে কাজটা করতে যাচ্ছ। সেখানেই তোমার spot পড়তে আরম্ভ করলো। Spot-টা পড়লো কোথায়? মনের মধ্যে ত্রুটির থট্‌তো রয়ে গেল। ত্রুটি করে তুমি যদি অনুতপ্ত না হও, ব্যথা-বেদনা না আসে, মনের মধ্যে যদি তোমার লুকোচুরি না আসে, তাহলে spot পড়লো না।** যখনই তুমি যেই কাজ করতে যাবে, সেই কাজের মধ্যে যদি চিন্তা করো, 'কে দেখলো, কে বুঝলো,' অপরাধ হয়ে গেল।

আবার অনেকে desparate হয়ে যায় কখনো কখনো। 'মরছি মরছি, গেছি গেছি, যে যা বোঝে বুঝুক, আমি এই কাজ করবোই', এইভাবে অনেকে জোরগলায় কথা বলে। একটা শক্তি আসে। **'যে যা খুশী বলে বলুক, আমি এটা করবোই।' কথাটা তো তুমি হাতমুঠো করে জোরগলায় বললে। কিন্তু রাত্রে যখন তুমি বিশ্রাম নিচ্ছ, হাতটা কিন্তু শিথিল হয়ে গেছে। মনে মনে ভাবছো, 'কাজটা তো ঠিক হল না।** আমি এত উঁচু গলায় কথা বলেছি, চিৎকার করেছি, মা কি ভাবলেন। বাবা কি ভাবলেন। জ্যাঠা, খুড়া কি ভাবলেন, আত্মীয়-স্বজনরা কি ভাবলেন? আমি চিৎকার করে কাজ করলে তো হবে না।' কথাটা বুঝলা? চিন্তাগুলো আসছে। General কথা বলছি। আবার আরেকদিক থেকে চিন্তা করছো, 'তুমি কাপুরুষের মতো থাকছো কেন? আমি যদি তোমার জন্য মাঠে নামতে পারি, তুমি আমার জন্য পারবে না কেন? এতদিন তোমাকে এই ভালবেসেছি? এই তোমার

ভালবাসার জোর? এই তোমার মনের জোর? আমি তোমার জন্য রাস্তায় নামতে পারি, যখন তখন চলে যেতে পারি, যখন তখন বেরিয়ে যেতে পারি, তুমি পারবে না কেন? আমি কারও পরোয়া করি না।'

তাহলে দেখা যাচ্ছে, তোমার কার্যকলাপে যদি মা ব্যথা পান, বাবা ব্যথা পান, আত্মীয়স্বজন ব্যথা পায়, যেকোন কাজ, সেটা ভালবাসাই হোক, চুরি ডাকাতি হোক, রোজগারই হোক; যে কোন দিকে যা কিছু করতে চাও— desparate তুমি ঠিকই, পরে কিন্তু তুমি নিজের ভিতর নিজে অনুতপ্ত হয়ে পড়ছো। **অনুতাপের হাত থেকে যদি তুমি রেহাই পেতে পার, তুমি কিছুটা রক্ষা পেতে পার। অন্যায় করলে অনুতাপ হবেই। বিবেক তোমার সাথে compromise করবে না।** সবাই তোমার সাথে compromise করার চেষ্টা করতে পারে, কিন্তু বিবেক কখনও compromise করবে না।

এইভাবে Natural gift হিসাবে সহজাত যে বস্তুগুলো তোমার ভিতরে আছে, তুমি কতটা তার সদ্ব্যবহার করছো, এইটাই দেখবে nature. বিবেক, চৈতন্যের মাধ্যমে Nature always follow করছে তোমাকে। Nature সবসময় তোমাকে fallow করে চলছে। সাংঘাতিক অবস্থা। কথাগুলো যা বললাম, মনে রেখো। আজ এই থাক। রাম নারায়ণ রাম।

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

অপরাধ ও পতন হয়, দ্বিধা, সন্দেহ আর অবিশ্বাসের ফলে

২০শে মে, ১৯৬১
৪৬ ভুপেন বোস এ্যাভিনিউ, শ্যামবাজার, কোলকাতা

স্বচ্ছ মনে চিন্তার মাধ্যমে যা-ই করা হয়, যা-ই করা যায়, তাই সত্যিকারের সত্যি হয়ে দাঁড়ায়। 'হবেই হবে' যদি মাত্র এইটুকু ঠিক রাখতে পারো; অর্থাৎ মনের গভীরে, মনের অগোচরেও যদি দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, সন্দেহ কিছু না থাকে তাহলেই হবে। এটাই হলো মনের ভিতরের নিজস্ব মিটার; যা বিবেকের কম্পাস কাঁটার ইঙ্গিত। তার ঠিক বিপরীতমুখী হচ্ছে পতনের টান। **কাজটায় অপরাধ আদৌ হয়ই না, যদি 'স্বচ্ছ মনে'তে কাজটা করা যায়। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রতিটি চিন্তার পিছনে একরকমের 'কিন্তু' (দ্বিধা, সন্দেহ) তাড়া করেই চলেছে। অপরাধ ও পতন হয়, ঐ দ্বিধার, সন্দেহের আর অবিশ্বাসের ফলে। ঐ 'কিন্তু, ধরে ফেললেই মুস্কিল।**

যেমন lense-এর মাধ্যমে সূর্যরশ্মিকে টেনে এনে আগুনে পরিণত করে, ঠিক তেমনই **'স্বচ্ছ মনে'র পটেতে ইচ্ছার Engine-এ firing ক্ষমতাটা যদি সূঁচের অগ্রভাগের ন্যায় তীক্ষ্ম ও সূক্ষ্ম হয়, তবে ভাবামাত্র ঐ plane-টাকে হুড়মুড়িয়ে নামিয়ে আনাটা অসম্ভব কিছু নয়।** চিন্তার সাথে সাথে কাজটা হয়ে বসে থাকবে। এটাই সত্যি, এটাই নিয়ম। এটাই হল ইউনিভার্সের মিটার। ওই হ'ল conscience (বিবেক)। ওর কাজ হচ্ছে,

তোমাকে always conscious (সচেতন) করে দেওয়া। Every step-এ Every moment-এ 'ও' (বিবেক) শুধু বলবে, শুধু বলবে, "This is correct!" শুধু এইমাত্র বলবে। ওর (বিবেকের) দেখানো correct-এর পথে থাকা আর clean থাকা একই। **চিন্তায়, কথায়, কাজে clean হওয়া চাই। ওইভাবে আমি যদি বলি একটা গাছকে, "তুমি মাথা নোওয়াও।" Bound to do. নোয়াবেই গাছটা।**

অনেকসময় দেখা যায়, হয়তো একটা কাজে গেলাম, কাজটা হচ্ছে না। Original কাজটাও হচ্ছে না, এটাও হচ্ছে না। একটা dilema-তে পড়ে গেলাম। তখন কি করছি জানা নেই। নিজের অজান্তেই একটা decision নেওয়া চাই। এটা 'কিন্তু'র কোন কাজই নয়। তখন deep common sense-এর উপরে নির্ভর করেই decision নিতে হয়। **যখন যে কাজ করবে, এক কথায় সেটাকেই মনে করবে, একটা গুরুত্বপূর্ণ Subject. ভিতরের Pin-টা যদি ব্যবহারে রাখো, তেল দিয়ে always পরিষ্কার রাখতে পারো, তবেই ব্যাস্। এটাই Inborn (জন্মসিদ্ধ) ছাড়া হতে পারে না।** ওখানেই ভিতরকার আসল, ভিতর থেকে আসল।

ঐ যে অনেকে সাধু গুরু মহান সেজেছে; ৮০-বছরেও সাধু হলে কি হবে, আগের আগের ২০ বছরের শয়তানিটা যাবে কোথায়? ওর দরুণ বাইরের language-টা রইল, আবার ভিতরের প্রভাবটাও রইল। ভিতরের প্রভাব রয়ে যাবেই, থাকবেই। একমাত্র In born quality নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছেন যাঁরা, তাঁদেরই সেটা থাকে না। সেই যে 'কিন্তু'র কথা বলেছি, ওটা বড় সাংঘাতিক।

ছোটবেলায় একবার আমি নৌকা করে চলেছি। একটা ঘাটে নৌকা থেমেছে। সেখানে বহু নৌকা, বজরার ভীড়। হঠাৎ আমার পায়ে পড়ে চিৎকার করে কান্না, "বাবা, আমার ছেলেকে এনে দাও।"

আমি বলি, "কি বিপদ! আমি কাঁঠাল খাব। লোক পাঠিয়েছি কাঁঠাল কিনতে। কোথা থেকে তোমার ছেলেকে এনে দেব?"

সে বলে, "আমার ছেলে নদীতে পড়ে গেছে বাবা। আমার মা আর ছেলে ছিল আরেক নৌকায়। আমি অন্য নৌকায়। পাশাপাশি দুটো নৌকা। আমার মা ঐ নৌকা থেকে আমার হাতে ছেলেকে দিতে গেছে। আমি ঠিকমত ধরতে পারিনি। ছেলে টুপ করে জলে পড়ে গেছে। বাঁচাও বাবা, আমাকে বাঁচাও।" সে কি চিৎকার করে কান্না।

আমি দেখি, সর্বনাশ। বিশাল নদী। এপার ওপার দেখা যায় না। এর মধ্যে কোথায় খুঁজি। আমি আমার X-ray eye fit করলাম। দেখতে দেখতে দেখি, নোঙ্গরের জন্য যে শিকলগুলি বেঁধে রেখেছে, তারই একটা শিকল ধরে বাচ্চাটা জলের মধ্যে বারি খাচ্ছে। অনেক শিকল; এক, দুই, তিন করে গুনতে গুনতে ঠিক শিকলটায় গিয়ে বাচ্চাটাকে টেনে তুললাম। দেখতে দেখতে প্রচুর লোক হয়ে গেল। ওখানেই এসে সব দীক্ষা নিতে লাগলো। আমার আর কাঁঠাল খাওয়া হলো না। নৌকা থেকে নামিয়ে আমাকে নিয়ে গেল। কয়েকদিন ওখানেই থাকতে হলো। আশেপাশের গ্রাম থেকে অনেকে এসে দীক্ষা নিল। বিরাট ব্যাপার।

সেটা (সেই যে খুঁজে পাওয়াটা) কি করে হ'ল? কি ক'রে সম্ভব হল? কারণ শিশুবয়স থেকে আমি আমার কাজ নিয়েই থাকি। আমি তো মহাকাশের মহাশূন্যের সুরের মধ্যেই থাকি। সেই সুরের সাথে সুর মিলিয়ে চলা আমার কাজ। তাতেই আমি নিবিষ্ট হয়ে আছি। **Time আমার short. এই short period-এর মধ্যে আমি আমার কাজ করে যেতে চাই। আমি আর কিছু শুনবো না। আর কিছু চলবে না। এইসব কিছু থাকবে না। আগের কিছু থাকবে না।**

এই যে কোটি কোটি বছর এই পৃথিবীর বয়স; এই শত শত কোটি বছরে এই দুনিয়ায় কতো তো মহান ব্যক্তিরা এসেছেন। তার মধ্যে পৃথিবীর জন্ম থেকে আজ পর্যন্ত আবর্ত্তনে বিবর্ত্তনে কত যে ঘটনা ঘটে গেছে; কতরকম কত কী হয়ে গেছে; মাঝে কত পরিবর্ত্তন হয়েছে। সেইসব পরিবর্ত্তন হতে হতে আজ জীবের সৃষ্টি। জীবের যে জীবন, তার ভিতর যে চেতন, তারও যে চৈতন্য, তা থেকেই ধীরে ধীরে, সৃষ্টির প্রথম মুহূর্ত্ত থেকেই সব সৃষ্টি; সবকিছু। সমস্ত বিষয়বস্তুরই life আছে। যা দেখ, সবই live; জীবন্ত। মনে রেখ, সবই জীবনরসে পরিপূর্ণ।

আজ এই থাক। রাম নারায়ণ রাম।

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

আমার স্নেহের সমুদ্রে অবগাহন করে, তোমরা তৃপ্ত হও, তৃপ্তির সুর খুঁজে নাও।

সুখচর ধাম
১৪ই মে, ১৯৮২

দৈনন্দিন জীবনে আমরা জ্ঞাতসারে এবং অজ্ঞাতসারে অসংখ্য অপরাধ করে চলেছি। এই অপরাধগুলো কিসে কিসে হয় এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে প্রকৃতির নিয়মে কতটা সাজা পেতে হয়, সে বিষয়ে জন্মসিদ্ধ ঠাকুর শ্রীশ্রী বালক ব্রহ্মচারী মহারাজ কৃপা করে আমাদের কিছু কিছু জানিয়ে দিতে রাজী হয়েছেন। শ্রীশ্রীগুরুর কৃপায় এই নির্দেশাবলীর মাধ্যমে যদি আমরা নিজেদের সংশোধন করে প্রকৃতির কঠোর দণ্ড হতে অব্যাহতি লাভ করতে পারি, তবেই আমাদের জন্মলাভ সার্থক হবে। এটি সম্পূর্ণ ঘরোয়ানা কথা এবং সমস্ত তর্ক-বিতর্কের ঊর্দ্ধে।

‘‘আমি যে কাজে এসেছি এই পৃথিবীতে, সেটি আমারই ঘরোয়ানা। সম্পূর্ণ আমার নিজস্ব কাজে এসেছি। যাবার পথে যদি কাউকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারি, নিয়ে যাব। অনেকদূরের রাস্তা তো। আমার গাড়িতে খালি জায়গা আছে, যদি কেউ যায়, নিয়ে যেতে পারি এই পর্যন্ত। এ ব্যাপারে কারও সাথে আমার কোন কড়ার (শর্ত্ত) নেই, কোন বাধ্যবাধকতা নেই। এটি সম্পূর্ণ নির্ভর করছে প্রকৃতির আইনের ধারার উপর। আমি সম্পূর্ণ আইন মেনে চলি। এখানে যত আইন আছে, কোনটিরই বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম

করি না। তোমরা যদি প্রকৃতির নিয়মের ধারা মেনে চলো, সুখের সংসার গড়ে তুলতে কোন অসুবিধা হবে না। তোমাদের অনুরোধেই অসংখ্য অপরাধের কিছু কিছু জানিয়ে দিলাম। সবকিছু জানানো সম্ভব হল না। সময়ও সংক্ষিপ্ত। এতে যদি কারও উপকার হয়, উত্তম কথা। আর কেউ যদি এ জানানোতে গুরুত্ব আরোপ না করে গতানুগতিকভাবেই জীবনের গতিকে এগিয়ে নিয়ে চলে, সেখানেও আমার কিছু বক্তব্য নেই। আমি জানার পথের পথিক। সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে জানিয়ে দিয়ে যাচ্ছি মাত্র।

মনে মনে মৃত্যুর ইচ্ছা হওয়াটাই অপরাধ। অনেকে বলে, ‘‘আর থাকতে ইচ্ছে করে না।’’ ভাল লাগে না। সূক্ষ্মে অপরাধ করে চলেছে।

অনেকে আবার ভাবে, ‘‘আমি রেলের তলে মাথা দেব। Accident করে মরবো, বিষ খাবো, আত্মঘাতী হবো’’— মনে মনে ভাবলেই চরম অপরাধ। যারা বিষ খেয়ে, জলে ডুবে বা আগুন লাগিয়ে মরে অর্থাৎ যেকোন প্রকারে স্বেচ্ছায় মৃত্যুকে বরণ করে বা আত্মহত্যা করে, প্রকৃতির নিয়মে কঠোর সাজা অপেক্ষা করছে তাদের জন্য। অনন্ত কোটি বছরের জন্য তাদের আগুনে ফেলে দেওয়া হয়। সেখানে মৃত্যু নেই, আছে শুধু আগুনের দুঃসহ জ্বালা। তারা শুধু জ্বলতেই থাকবে, মরবে না। তাই মনে রেখো, সংসারে ক্ষণিকের জন্য অশান্তি সহ্য করতে না পেরে, সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য কত কোটি বছরের যন্ত্রণা টেনে আনলো তারা। তোমরা কখনও এমন করো না।

যে কোন ব্যক্তি যে কোন কারণে যে কোন কথা বললে,

সেই পরিপ্রেক্ষিতে সেই কথাটুকু শুধু শুনবে। ধারণা করে বাড়তি কোন কথা বলবে না। তোমার আচার আচরণে কোনরকম অসৌজন্য প্রকাশিত হলে, মা বাবা অথবা বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিরা সে সম্বন্ধে বলবেনই। যেমন কাউকে হয়তো বলা হল, ‘এত অবেলায় ঘুমাচ্ছিস কেন? না বলে কোথায় বেড়িয়ে গিয়েছিলি? ওখানে চুপ করে বসে আছিস্ কেন? এত যে ডাকাডাকি করা হচ্ছে, শুনতে পাচ্ছিস্ না?’

এর উত্তরে যদি সে বলে, ‘কেন আমি বুঝি কাজ করি না? আমি একটু বসলেই সকলের নজরে পড়ে। আরও তো অনেকে আছে, তাদের তো বল না। আমাকে বলতে বুঝি খুব সুবিধা’, অপরাধ। নম্রভাবে সহজ সুরে তার উত্তর দেওয়া উচিত ছিল। কোন সহজ কথাকে বক্রদৃষ্টিতে গ্রহণ করে যদি উত্তর দেওয়া হয়, এটাও অপরাধ। সহজ কথার প্রত্যুত্তরে যদি ব্যথা বা দুঃখ লাগে, তবে যার কথায় আঘাত পেলে, তার অপরাধ হবে।

মনে কর, তুমি কারও উপরে রাগ করেছ। সেই রাগের যথাযথ কারণ থাকতেও পারে, নাও থাকতে পারে। সাধারণতঃ ঘর সংসারে মানুষজন যার উপরে রাগ করলো, তার সব কাজ বক্রদৃষ্টিতে দেখতে লাগলো। তার হাঁচি কাশি কথাবার্ত্তা সব কাজেই তখন ত্রুটি খুঁজছে। সে যদি হাসে, ‘ঐ আমাকে দেখে মুচকি হাসলো; ঐ আমাকে দেখে নাক সিঁটকালো।’ সে হাঁচি দিচ্ছে, কাশি দিচ্ছে, যা কিছু করছে, যতই চিন্তা করছে, তার প্রতি রাগও তত বাড়ছে। ধারণা করে সঠিকভাবে না জেনে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা অপরাধ। তুমি তাকে জিজ্ঞাসা করবে, ‘তুমি কি আমাকে দেখে হাসলে?’ সে যদি হাসে তোমাকে দেখে, বিদ্রূপ করে, তার অপরাধ। আর যদি তোমার জিজ্ঞাসার উত্তরে সে

বলে, ‘না, আপনাকে দেখে হাসিনি তো’। তাহলে অযথা মিথ্যা ধারণা করাতে তোমার অপরাধ।

তুমি হয়তো বুঝতে পারছো, কেউ তোমাকে নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করছে। তাকে জিজ্ঞাসা করাতে সে যদি তা অস্বীকার করে, সেটাই সত্যি বলে মেনে নেবে। সে যদি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করেও তোমার কাছে মিথ্যা কথা বলে, তার অপরাধ হবে।

আগেই বলেছি, ধারণা করে মন্তব্য করাও অপরাধ। মনে যদি প্রশ্ন জাগে, জিজ্ঞাসা করে নেবে। মনে কর, কারও উপরে তোমার রাগ হয়েছে, সে জিজ্ঞাসা করলে যদি স্বীকার কর, safe হয়ে গেলে। মিথ্যা বললে ত্রুটিতে পড়ে যাবে।

সংসারে কাজ কেউ বেশী করে, কেউ কম করে। কেউ অধিক দায়িত্বসম্পন্ন; কর্ত্তব্যবোধ কারও বেশী। আবার কেউ ততটা নয়। সাধারণতঃ সংসারে কাজ থাকে অনেক। মনে কর, কেউ এড়িয়ে গেল, ফাঁকি দিল, কাজ করলো না। সেখানে দেখতে হবে, তোমার এড়িয়ে যাওয়ার বুদ্ধি হয়েছে কিনা। অন্য কোন কাজের নামে, অন্য কোন কাজের দোহাই দিয়ে বাড়ী থেকে বেড়িয়ে গেছ কি না। সংসারের কাজের চেয়ে তোমার কাজটির প্রয়োজন বেশী কি না। যদি তোমার কাজটির প্রয়োজন বেশী থাকে, রক্ষা পাবে। না হলেই ত্রুটিতে পড়বে। আটকে যাবে।

অন্যে কথা বলছে, হাসাহাসি করছে। কখনও ভাববে না তোমাকে বলছে বা তোমাকে নিয়ে বিদ্রূপ করছে। যাতায়াতের পথে অন্যের কথাবার্তার মাঝে একটি শব্দ তোমার কর্ণগোচর হল। তুমি তার অগ্রপশ্চাৎ বৃত্তান্ত কিছুই জান না। অমনি শব্দটিকে নিজের সম্বন্ধে ধরে নিয়ে মুখ গোমড়া হয়ে গেল। ‘জানি জানি’—

আরম্ভ হল। দুঃখ হা হুতাশ শুরু হয়ে গেল। সম্পূর্ণ না জেনে দুঃখ পাওয়া ত্রুটিমূলক। ধারণা হলেই জিজ্ঞাসা করে নেবে। যাকে জিজ্ঞাসা করলে সে হয়তো বললো, ‘‘এই শব্দটি এই কারণে ব্যবহার করেছি। আপনার সম্বন্ধে বলি নাই।’’

যদি আড়ালে কেউ কারও সম্বন্ধে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, নিন্দা সমালোচনা করে, তার অপরাধ। মনে কর, ‘ক’-র ধারণা ‘খ’ ও ‘গ’ তার সমালোচনা করে। তখন ‘ক’ পরিষ্কার জিজ্ঞাসা করবে ‘খ’ ও ‘গ’-কে, ‘‘তোমরা কি আমার বিষয়ে আলোচনা করেছ?’’ ‘খ’ ও ‘গ’ হয়তো বললো, ‘হ্যাঁ করেছি’। তখন জেনে নিতে পারবে, কি আলোচনা করেছে। আর যদি বলে, ‘না করিনি।’ তখন ‘ক’ বলে দেবে, ‘‘আমার মনে ধারণাটি জেগেছিল। তাই আমি জিজ্ঞাসা করে জেনে নিলাম।’’

মনে কর, ‘ক’-কে আমি কাজের জন্য ডাকি। ‘এই কর’, ‘সেই কর’ বলে আদেশ করি। তখন যদি আরেকজন বলে, ‘ঠাকুর ওকেই কাজের জন্য ডাকেন। ‘ও’ আমাদের নামে নালিশ করে ঠাকুরের কাছে। ঠাকুর আমাদের জিজ্ঞাসাও করেন না।’ এটা চিন্তা করাও অপরাধ।

যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করে, আমি বলবো, ‘‘ ‘ও’ কারও নামে নালিশ করে না। ওর ব্যক্তিগত কথাই বলে। আর যদি কখনও অন্যের সম্বন্ধে কিছু বলে, ভালো করার চিন্তা ও ভালোর উদ্দেশ্যেই বলে। হয়তো বললো, এখানকার ছেলেমেয়েদের আরও ভাল হওয়া উচিত। এতভাবে ঠাকুর শিক্ষা দিচ্ছেন। কেউই যেন সঠিকভাবে গ্রহণ করতে পারছে না। এতে ‘ও’ দুঃখই প্রকাশ করে।’’ আমার কথা বিশ্বাস না করলে মারাত্মক অপরাধ।

মনে কর, ‘ক’ আমার কাছে এসে বলছে, ‘খ’ এই এই করেছে, ‘গ’ এই করেছে। আমি তাকে বলি, ‘‘তুমি কি সঠিকভাবে জানো, তারা এই করেছে? না, ব্যক্তিগত রাগ প্রকাশ করছো? একথা আমাকে এসে কেন বলছো? ওদের কি জানিয়েছ?’’

— আজ্ঞে না।

আমি বললাম, ‘তুমি ওদের জানাও।’

‘ক’ বলছে, আমি যদি একথা জানাতে যাই তাহলে বলবে, ‘‘আপনি এমন নাকি? শান্তভাবে থাকেন আর নালিশ করে করে ঠাকুরের মন বিগড়ান।’’ আমি তখন ‘খ’ ও ‘গ’-কে ডেকে বললাম, ‘‘ ‘ক’ তোমাদের সম্বন্ধে এই কটি কথা জিজ্ঞাসা করছে। কথাগুলো কি ঠিক?’’ ওরা সত্যি কথা বললে বাঁচলো। আর মিথ্যা বললেই অপরাধে জড়িয়ে যাবে।

আমার এখানে অনেকে অনেক কাজ করে। আমার ঘরে হয়তো কেউ কাজ করছে। কেউ বসে আছে। যদি মনের স্বচ্ছতায় বসে থাকে, অপরাধ হবে না। যদি ইচ্ছে করে বসে থাকে, অপরাধ। আমি যদি কারও ওপরে কখনও অসন্তুষ্ট হই, তবে যে বিষয় নিয়ে বা যে কথাতে অসন্তুষ্ট হয়েছি, আমার অসন্তোষ তাতেই সীমাবদ্ধ থাকে। সেই ব্যক্তির অন্য বিষয়ের উপর কিন্তু আমার অসন্তোষ থাকে না। আমি তাকে খেতে ডেকেছি। জিজ্ঞাসা করেছি, ‘টাকা নিয়েছিস কি না।’

সে কিন্তু আমার উপর গম্ভীর হল এক বিষয়ে। এখন গম্ভীর সব বিষয়ে। আরেকজন ভাবলো, ঠাকুর ওকে তোয়াজ করছেন। মারাত্মক অপরাধ। মন্তব্য করাটাই ত্রুটি। যে কোন স্বচ্ছ

মনকে অযথা ব্যথা দেওয়ার অধিকার তোমার নাই। আমি আমার স্বচ্ছ মনে সব কাজ করে চলেছি। তাই বলেছি, যখন যেভাবের কথা বলছি, সেই কথাটুকুই শুধু শুনবে। অযথা কথা বললেই অপরাধ।

আমার কাছে সবাই সমান। যে আগ্রহ করে কাজ করতে এগিয়ে আসে, তাকেই আমি ডাকি। কারও প্রতি আমার কোন পক্ষপাতিত্ব নেই। কে কতটা কাজ করে বা করে না, সে প্রসঙ্গে কিছু বলি না। এই ব্যাপারে অনেকেই ভুল ধারণা করে বসে আছে। ‘‘জানি জানি যাদের ডাকার ঠিকই ডাকবে। আমাদের কথা তো বলে না। যারা সামনে কাজ করে, ওদের কাজের দাম বেশী, ওরা ঠিকই আছে। ওদের ঠিকই ডাকা হয়। ওরা যত অন্যায় করুক না কেন, ওদের কোন দোষ নেই,’’ ইত্যাদি।

আগেই বলেছি, ধারণার বশে যে যত মন্তব্য করবে, সে ততই অপরাধের জালে জড়িয়ে পড়বে। কাউকে হয়তো বললাম, ‘‘ওখানে বসে আছিস কেন? ঐ সময়ে তোর খোঁজ করেছিলাম। এগিয়ে আসলি না কেন?’’

তার উত্তরে সে যদি বলে, ‘‘আমি বাসন মাজছিলাম। গান লিখছিলাম অথবা অন্য কোন কাজ করছিলাম,’’ পরিষ্কার হয়ে গেল। কিন্তু তা না করে যদি মুখ গোমড়া করে বসে থাকে বা বাঁকাভাবে উত্তর দেয়, অপরাধ হবে।

আরেকজন বসে আছে আমার কাছে। তাকে বললাম, ‘‘তুই একটু পড়াশোনা শুরু কর।’’ উত্তরে সে বললো, ‘‘কেন আমি বসে থাকলে কি অসুবিধে হচ্ছে’’, মারাত্মক অপরাধ হয়ে গেল। আমি বললাম, ‘‘তোর কথায় আমি কিছু মনে করলাম

না। কিন্তু ভাল করে ভেবে দেখতো, কথাটা ঠিক বলেছিস কি না।’’ পরে অবশ্য সে আমার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছে। যে কেউ যেকোন ব্যক্তিসম্বন্ধে আমার কাছে কোন অভিযোগ করলে আমি শুধু শুনে যাই। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ডেকে সত্যমিথ্যা সম্বন্ধে সঠিকভাবে না জেনে কোন মন্তব্য করি না অথবা কোন ধারণা করি না। সংসার ক্ষেত্রে ত্রুটি হয় বেশী। সংসারে তোমরা না জেনে কোন ধারণা বা মন্তব্য করতে পারবে না। কে কোথায় গেল, কার সঙ্গে গেল, কেন গেল, না জেনে অযথা সন্দেহ করবে না।

আমি যদি কাউকে ডেকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করি, ‘তুই কি একথা বলেছিস্?’ তাহলে অনেকে মনে করে, কেউ বুঝি নালিশ করেছে এবং নালিশের ওপরে ধারণা করেই আমি সে কথা জিজ্ঞাসা করছি। আমি কিন্তু সহজ স্বচ্ছ মনেই কথাটি জিজ্ঞাসা করেছি। কেউ বলুক বা না বলুক, যা জিজ্ঞাস করেছি, যদি সহজ সরল মনে উত্তর দেয়, পরিষ্কার হয়ে গেল। কিন্ত নানা বিরূপ ধারণা করে যদি মনে মনে গুমড়াতে থাকে, অপরাধ হবে।

মনে কর, আমি কাউকে ডাকি, আদর করি, তাতে অন্যদের রাগ বা হিংসা হতে পারে। মনে মনে হিংসা বা রাগ পোষণ না করে ব্যাপারটি যদি আমাকে খোলা মনে জিজ্ঞেস করে, তাহলে পরিষ্কার হয়ে যায়। তাতো করে না। **অধিকাংশ মানুষের মনই অত্যন্ত সংকীর্ণ স্বার্থপরতায় ভরা। তারা আমার স্নেহ ভালবাসার মর্যাদা দিতে পারে না।**

জন্মগতভাবে প্রকৃতির সুর নিয়ে আমি এসেছি। সেই সুরে সেই সাড়াতেই সবাইকে গড়ে তুলতে চাই। আমার

স্নেহের সমুদ্রে অবগাহন করে তোমরা তৃপ্ত হও। তৃপ্তির সুর খুঁজে নাও। প্রকৃতির ভাণ্ডার তো অফুরন্ত। সমুদ্রের জল যতই নাও না কেন, সমুদ্র কি তাতে শুকিয়ে যায়? আলো, জল, বাতাস কোনটিই তো ফুরিয়ে যায় না। শেষ হয় না। তাই বারে বারে জানিয়ে যাচ্ছি একটিই কথা। **সঠিক বার্তা না জেনে অযথা ধারণা করা, কত বড় অপরাধ। কারও প্রতি হিংসা, বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা মারাত্মক অপরাধ।** আমি কুমোর মূর্তি গড়ি। যখন যেভাবে বুঝি, সেইভাবেই তৈরী করবো। দুর্গা প্রতিমা গড়তে হলে দশভুজা মূর্তিই গড়তে হবে। আর জগন্নাথের মূর্তি তৈরী করতে ঠুঁটো জগন্নাথই করতে হবে। আমার যাকে যেভাবে গঠন করা প্রয়োজন, সেভাবে বুঝে বুঝেই আমি তৈরী করবো। এখন জগন্নাথদেব যদি ক্রুদ্ধ হয়ে বলে, "ওর দশটা হাত, আমার একটা হাতও সম্পূর্ণ নয় কেন?" এই বলে যদি মারামারি শুরু করে, তাহলে কোন কাজই সুসম্পন্ন হবে না। সব পণ্ড হয়ে যাবে।

তাই বলছি, আমি যাকে যেভাবে বলি, সেই আদেশ মেনে চলতে চেষ্টা করবে। তাহলেই ত্রুটিমুক্ত হয়ে চলা সম্ভব হতে পারে। আর যদি হিংসা করতে যাও, ঠাকুর ওকে ডাকেন, 'ও' ঠাকুরের সেবা করার সুযোগ পায় ইত্যাদি, তাহলে প্রতিটি কথায়, প্রতিটি চিন্তায় অপরাধে যুক্ত হয়ে পড়বে। আগেই বলেছি, না জেনে কিছু বলা বা ধারণা করা অত্যন্ত অপরাধ। সব কথা সব সময় সবাইকে বলা যায় না। কারণ আমার কার্যপদ্ধতি, আমার সহজ সরলতা কেউ হয়তো সহজমনে নিতে পারবে না। শুনে সে ফ্যা ফ্যা করবে, জ্বলে উঠবে, মারামারি, কাটাকাটি করতে ছুটবে। তাতে তার ক্ষতি হয়ে যাবে। তার জন্যই অনেকসময় বলি, "এই কথাটা এখন ওকে জানিয়ো না।" পরে অবস্থা ও

সময় বুঝে আমি নিজেই সে কথা জানিয়ে দিই। মনে কর, কেউ হয়তো আন্দাজে বুঝেছে, তাকে একটি কথা গোপন করা হয়েছে। কেন বলা হল না, সে মনে মনে ফুঁসতে শুরু করে, "জানি আমাকে তো বলবেই না। যত আপনজন, প্রিয়জন তাদের কাছেই ঠাকুর বলবেন তাঁর মনের কথা। জানি তো, ঠিক জানি। এ আর জানি না।" — অপরাধ।

যাদের সাথে একত্রে বাস করছে, তাদের মধ্যেই একজন কথাটি তাকে বলে দিয়েছে। তখন চিৎকার, চেঁচামেচি, কান্নাকাটি, সে এক বিশ্রী ব্যাপার। যে আমার আদেশ অমান্য করে কথাটি তাকে বললো, সে অপরাধ করলো। তখন পরিস্থিতিকে আয়ত্তে আমার জন্য আমি তাকে ডেকে সব বুঝিয়ে বললাম। কেন তাকে বলা হয়নি, সেই কারণটিও বুঝিয়ে বলা হল। আমার কথা শুনে যদি সে শান্ত ও নম্রভাবে সব মেনে নেয়, ঠিক আছে। আর যদি বলে, "জানি জানি, এখন তো বলবেই। আমি জেনে গিয়েছি কি না, তাই বলতে এসেছো।" তাহলেই ত্রুটি হবে।

তোমরা সব সময় পরস্পর পরস্পরের কাজে সহযোগিতা করবে। একজন যদি কাউকে কোন কাজ করতে বলে। তার প্রত্যুত্তরে সে যদি বলে, "আমার সময় কোথায়?" এই কথাটি মিষ্টি করে বুঝিয়ে না বললে, ত্রুটি হয়ে গেল। আর যদি ভ্রূ-কুঁচকে বলে, "আমি কেন করতে যাব? এটা তো আমার duty নয়।" তবে তো ত্রুটি হবেই। প্রত্যেকটি কাজের জন্য প্রতি পদক্ষেপে লক্ষ্য করে না চললে একটু একটু করে ত্রুটি জমে যায়। শেষে বিরাট আকার ধারণ করে। **কারও চেহারা নিয়ে, কারও আচার-আচরণ নিয়ে বিদ্রূপ বা হাসি ঠাট্টা করবে না। "বুঝি বুঝি, জানি জানি, হাসি দেখলেই বুঝি, চেহারা দেখলেই বুঝি,"** আন্দাজে

ধারণার বশে মন্তব্য করলেই ত্রুটি হয়ে গেল।

তোমার বয়োজ্যেষ্ঠ কেউ তোমাকে কোন কথা বললেন। তুমি ঝাঁঝি মেরে তার উত্তর দিলে। তোমার কথাতে তিনি যদি অন্তরে দুঃখ পান, তোমার ত্রুটি হয়ে গেল। আবার বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিরা যদি প্রথমেই ধমক দিয়ে রূঢ়ভাবে কোন কথা বলেন, সেটা তাদের ত্রুটি। বয়সে বড় বলেই বকাবকি করার কোন অধিকার নেই। কথা বলবে মিষ্টি করে। উত্তর দেবে নম্রভাবে। আমি অপরাধের সম্পর্কে সব কিছু জানিয়ে দেব। শুনিয়ে ও বুঝিয়ে দেওয়ার পরেও যদি সেই ত্রুটি কর, তবে হবে দ্বিগুণ অপরাধ।

আগেই বলেছি, কোন্ প্রয়োজনে আমি কখন কি করি, না বুঝে, না জেনে যদি বলতে থাক, ‘‘ঠাকুর ওকে বেশী ভালবাসেন। ওর মন রক্ষা করার জন্য একাজ করেছেন। আমার সাথে কৌশল করেছেন। ওর দোষ চাপা দেওয়ার জন্য একাজ করেছেন। আমার বেলা তো এরকম করেন না,’’ ইত্যাদি প্রতিটি কথায় ও চিন্তায় দ্বিগুণ অপরাধ হয়ে যাচ্ছে। **আমি যখন যা কিছু করি, সবসময় ভালো মন নিয়ে ভালো করার উদ্দেশ্যেই করে থাকি। সংশোধন করার জন্য আমি প্রত্যেকের ত্রুটিগুলো ধরিয়ে জানিয়ে দিয়ে যাই। তাতে অনেকেই ভুল বোঝে।**

মনে কর, আমি ‘ক’-কে বললাম, ‘‘তুই এই কাজটা এইভাবে কেন করলি? এতে তো এই দোষ হয়ে গেল।’’

তার উত্তরে সে বললো, ‘‘হ্যাঁ, দোষ হয়েছে না। আমার বেলা দোষ তো হবেই। এই কাজ তো ওরাও করেছে। ওদের বেলা তো দোষ হয়নি।’’ রুদ্ধ আক্রোশে সে যেন ফেটে পড়তে

লাগলো। নিজের সংশোধনের পথটি সে বেছে নিল না। মারাত্মক অপরাধ।

সে যদি নম্রভাবে বলতো, ‘‘প্রভু আমার অন্যায় হয়েছে। আমি কিভাবে করবো, আমাকে শিখিয়ে দিন,’’ কতো সুন্দর হতো বলতো।

প্রতিটি কাজ করেই যদি আমাকে তোমাদের কাছে কৈফিয়ৎ দিতে হয়, তোমাদের প্রতি আমার স্নেহ, মমতা অক্ষুণ্ণ আছে জানাতে হয়, তবে তোমাদের ত্রুটি। তোমরা বেশীরভাগই ‘আমার বেলা’, ‘আমার বেলা’ একথাটি কেন বলো? আমি যাকে যেভাবে যে কথা বলবো, তার দাম সেভাবে দেবে। না হলে ত্রুটি হবে। ঘ্যান ঘ্যান মেজাজ, ক্ষণে ক্ষণে রাগ, গুরুজনদের মুখে মুখে তর্ক, মারাত্মক অপরাধ। নিজের অপরাধ পরিষ্কার করার জন্য সবার সামনে খুলে বলতে হয়। অপরাধ গোপন করাটাও অপরাধ।

আমি সবার সামনে পরিষ্কারভাবে সব খুলে বলি। কেন বলবো না? তাদের জন্য আমি কেন পাপের ভাগী হবো? কারও পাপের ভাগী কেউ হবে না। মারামারি, কাটাকাটি, হিংসা, খুন চিন্তা, অযথা কারণে অকারণে মন খারাপ করা, মারাত্মক অপরাধ।

আগেই বলেছি, **তোমরা প্রত্যেকে প্রত্যেকের সাথে সহযোগিতা করবে। কেউ কাউকে হিংসা করবে না, ভুল বুঝবে না। ভাল করার উদ্দেশ্য নিয়ে স্বচ্ছ মনে আমি কাজ করি। কাউকে সংশোধন করার জন্য যদি ধমক দিই, চিৎকার করে কথা বলি বা শাসন করি, তাহলে অনেকে মনে করে, ‘ঠাকুর**

সবার সামনে বলে আমাকে অপমান করলেন।' কাউকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য বা কারও সম্মান নষ্ট করার জন্য আমি কিছু করি না। তোমাদের অপমান করা আমার উদ্দেশ্য নয়। তোমাদের সম্মান নষ্ট করতে আমি যাব কেন? আমি যদি কিছু বলে থাকি, একজনকে কেন্দ্র করে সবাইকে গড়ার উদ্দেশ্যেই বলি। কাউকে হয়তো ঠাটিয়ে মারি, পরমুহূর্তেই তার জন্য প্রসাদ মেখে রাখি। অন্যেরা ভাবে, 'ঠাকুর ওকে তেল দিচ্ছেন।' কতবড় অপরাধ।

একটি ক্ষুদ্র বালুকণার দাম আছে কি? দাম আছে পৃথিবী গড়ার পক্ষে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালুকণা একত্রিত হয়েই এই বিশাল পৃথিবী গড়ে উঠেছে। আবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলবিন্দু নিয়েই বিরাট সাগরের সৃষ্টি হয়েছে। **ছোট ছোট ত্রুটি একত্রিত হয়েই বৃহৎ ত্রুটি। প্রকৃতির ন্যায়ের দণ্ডে কেউ যে রেহাই পাবে না। অপরাধের সাজার হাত থেকে কারও মুক্তি নেই। এসব সম্পূর্ণ আমার ব্যক্তিগত কথা।** এই নিয়ে আমি কোন তর্কবিতর্ক করতে চাই না। মৃত্যুর পরে কি আছে, কি নেই, সে বিষয়ে আমি কিছু বলবো না। আমি শুধু বলছি, তোমাদের কথায়, কার্যে, চিন্তায় যে যত অপরাধ করে যাচ্ছ, একেবারে চরম শাস্তি অপেক্ষা করছে প্রত্যেকের জন্য। এই জ্বালার শেষ নেই। এই শাস্তির হাত থেকে মুক্তি নেই।

এখানে আমার কথা ভাল না লাগতে পারে। রাগ করে, ভুল বুঝে আমার কাছে আর না আসতে পার, তাতে আমার কিছু হবে না। আমার এই নির্দেশকে, তোমাদের ভাল করার চেষ্টাকে, জ্বালা-যন্ত্রণা মনে করে অস্থির হয়ে রেলের তলায় মাথা দিতে পার, তাতে কি হল। প্রকৃতির বাইরে তো যেতে পারলে না। যত ডুববে, নদীর জলেই ডুবে মরবে। নদীর হাত থেকে রেহাই নেই।

অনেকে তো রাগ করে বাড়ী চলে যায়। বাড়ীতে বসে থাকে বছরের পর বছর। আসে না। আমি স্নেহভরে ডেকে পাঠাই। ভাবি, 'আবার একবার ডাকি, যদি সংশোধন হয়।' আমার কার্যাবলী দিয়ে তোমরা নিজের চরিত্রকে বিচার করে দেখ, ভুল কোথায়, ত্রুটি কোথায়। জীবনের অঙ্ক কষতে শেখ। পাঁচে পাঁচে দশ, সাতে তিনে দশ; যোগে ঠিকভাবে যুক্ত হতে পেরেছ কিনা ভাব। ভেবে ভেবে নিজেকে বিচার কর। **ধীর স্থির নম্র হয়ে, গুরুগত প্রাণ হয়ে যদি থাকতে পার, এরচেয়ে সুখের ঘর আর নেই। সূর্যমুখী ফুল সূর্যের দিকেই চেয়ে থাকে। সূর্যের সাথে সাথেই ধীরে ধীরে পূর্ব থেকে পশ্চিমে যায়। সূর্যমুখী ফুলের মত গুরুমুখী মন রাখতে হবে। তবে তো হবে।**

নালিশ কোন্‌টা, শাসন কোন্‌টা, স্নেহ কোন্‌টা বুঝতে হবে। তোমার বয়োজ্যেষ্ঠ কোন ব্যক্তি তোমাকে বললেন, 'কাপড়টা এত উঁচু করে চলছিস্ কেন?' তুমি তো কাপড়টা ঠিক করে নিলেই না। উপরন্তু বললে, 'আপনি তো এই দেখবেন। আর কোন্‌দিকে নজর দেবেন?' তোমার কথায় তিনি লজ্জা পেয়ে গেলেন। কত বড় অপরাধ।

প্রত্যেকে অত্যন্ত সংযত হয়ে গুরুজনের সম্মান রেখে মিষ্টি করে কথা বলবে।

কেউ বললো, 'একটা বাসন মাজতে এতটা সার্ফ লাগাচ্ছিস কেন?'

উত্তর ঃ কেন? আপনার সে বিষয়ে কি দরকার? সার্ফের খরচ কি আপনি দেবেন?

সে ব্যক্তি একেবারে চুপ হয়ে গেল।

আরেকটি প্রশ্ন ঃ আরে, একটা বাটি ধুতে এতটা জল লাগাচ্ছিস কেন?

উত্তর ঃ কেন? খরচটা কি আপনি দিচ্ছেন নাকি? আপনি বালতি বালতি জল ঢালেন না? সেইবেলা মনে থাকে না।

আরেকজন ঃ কাঁচের গ্লাস মাজতে অন্যমনস্ক হচ্ছিস কেন? পড়ে গেলেই ভেঙে যাবে।

উত্তর ঃ থাক। আপনাকে অত চিন্তা করতে হবে না। ভেঙে গেলে আরেকটা নিয়ে আসবো।

প্রশ্ন ঃ বাসন মাজার সময় নীচে যদি একটা বস্তা বা ছালা পেতে রাখিস্, তাহলে আর ভেঙে যাওয়ার ভয় থাকে না।

উত্তর ঃ থাক্ আপনাকে আর অত জ্ঞান দিতে হবে না। নিজের কাজ করুন গিয়ে।

আরেকটি জিজ্ঞাসা ঃ আলুর খোসা এমন করে ছাড়াচ্ছ কেন? আর একটু পাতলা করে ছাড়াও না।

উত্তর ঃ থাক্ থাক্, অত জ্ঞান দিতে হবে না। আমি আমার নিজের কাজ ভালই বুঝি। বেশী দরদ হলে আপনি নিজে এসে কাটুন।

সাধারণ সংসারে দৈনন্দিন জীবনের কয়েকটি প্রশ্নোত্তরের নমুনামাত্র দেখালাম। প্রত্যেকটি উত্তরই কিন্তু ত্রুটিমূলক। অপরাধের বোঝা ক্রমশঃই ভারি হয়ে যাচ্ছে। কেউ হয়তো সকালবেলার কাজকর্ম না করে বেলা পর্যন্ত ঘুমোচ্ছে। তাকে যদি আরেকজন বলে, ‘‘এত বেলা পর্যন্ত ঘুমোচ্ছিস্? এখনও বিছানা তুলিস্নি কেন?’’

তাকে যদি শাসন করার জন্য, জব্দ করার জন্য অথবা সবার মাঝে ভুল দেখাবার জন্য কথাটা বলা হয়, তবে যে বলছে, সে অপরাধে ঠেকবে। কিন্তু যেভাবেই বলুক না কেন, কথাটাতো সত্যি। যাকে বলছে সে যদি নিজের ভুলটা স্বীকার করে নিয়ে বলে, ‘‘হ্যাঁ ভাই, আমার ভুল হয়ে গেছে। ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। এখুনি বিছানা তুলে দিচ্ছি।’’ তাহলেই জিনিসটা সুন্দর হয়ে যায়। যে বলেছে, সে যদি কোন উদ্দেশ্যমূলকভাবেই কথাটা বলে থাকে, তবে নিজেই লজ্জা পেয়ে যাবে। কিন্তু তাতো হল না।

‘‘এখনও বিছানা তুলিস্নি কেন?’’ বলার সঙ্গে সঙ্গে উত্তর এল, ‘‘আমার কাজ আমি যখন খুশী করবো, তুই আমার উপর মাতব্বরি করতে এসেছিস কেন?’’ অপরাধে আটকে গেল।

একটু নম্র হলে, একটু adjust করে চললে, সংসার কত সুখের হয়। চেষ্টা করলে পালন করা কঠিন কিছুই নয়। কঠিন ভাবলেই কঠিন। কঠিন না ভাবলেই সহজ। আমি যখন আলাপ আলোচনা করি, সবাইকে সবসময় ডেকে শোনানো সম্ভব হয় না। আমার সময় অত্যন্ত কম। সব সময় নানা কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়। এতেও অনেকে ভুল বোঝে।

আমার উদ্দেশ্যে বলে, ‘‘জানি জানি, আমার কথা মনে পড়বে কেন? আমাকে ডাকবে কেন? আমি তো বাইরের লোক। যাদের নিয়ে আলাপ করা দরকার, ঠিকই করছেন। যারা যারা ভালবাসার জন, তাদের ঠিকই ডেকেছেন।’’ অপরাধ। স্বচ্ছ মনের মধ্যে আক্রমণ করাটাই অপরাধ। সমুদ্রের পারে ঝিনুকের মতো অপরাধ কুড়াতে কুড়াতে চর পড়ে যাচ্ছে যে। প্রতি মুহূর্তে মুহূর্তে self-suicide হয়ে যাচ্ছে।

যারা আমার উপর নির্ভর করে চলে, আমার মনের দিক থেকে যেন পবিত্র মন নিয়ে তাদের গড়ে তুলতে পারি। সেই চেষ্টাই করে গেলাম। আমি যে দৈবের আশ্রয় নিয়ে এসেছি, তার পরিপ্রেক্ষিতেও তোমাদের প্রতি স্নেহের দাবীতে এই কটি কথা বললাম। স্নেহের দাবী ঠিকই আছে। আগে বলেছি, **আমার ব্যক্তিগত কাজে আমি এই পৃথিবীতে এসেছি এবং আমার নিজস্ব চিন্তাধারায় কথাগুলো বলেছি। এতে তোমরা উপকৃত হবে কিনা অথবা কতটা উপকৃত হবে, সে তোমাদের ব্যাপার।**

আমার ব্যক্তিগত ধারণা দিয়ে তোমাদের উপকার করলাম। এখন গ্রহণ করা বা না করা তোমাদের ইচ্ছা। গুরুগতপ্রাণ হয়ে থেক। গুরুর নির্দেশ পালন করার চেষ্টা করো। কখনও গুরুর গুরুত্ব লঙঘন করার চেষ্টা করো না। সেটি হলো অলঙঘনীয় অপরাধ। কৃষ্ণ অর্জুনের সাথে সখার মত মিশতেন। হাস্য পরিহাস করতেন। কিন্তু অর্জুনকে বলে দিয়েছিলেন, ‘‘অর্জুন কখনও খেলাচ্ছলেও ভুলে যেও না, তুমি ঢোঁড়া সাপ আর আমি জাত কেউটে।’’ অর্জুন সদাসর্বদা সেটি মনে রেখে চলবার চেষ্টা করতেন। তোমরা আমাকে মাতা পিতার মত ভালবাস। সেইভাবেই আপন করে হৃদয়ে ধরে রেখো।

আমার হৃদয়েও তোমরা চিরদিন থাকবে অম্লান হয়ে।

কথাগুলি মনে রাখার চেষ্টা করো। আজ এই থাক। রাম নারায়ণ রাম।

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

তোমার মধ্যে যে পঙ্কিলতা, তার আড়ালেই বসে রয়েছে দেবতা

পাম এ্যাভিনিউ, কলকাতা
৪ঠা সেপ্টেম্বর, ১৯৬৬

দেরী হয়ে গেল। তত্ত্ব বললে দেরী হয়ে যাবে। ঘরোয়ানা কথা বলি। ২৫ বছর আগের কথা বলছি। এক জায়গায় ধর্মসভা হচ্ছে। সেখানে বহু পণ্ডিত, পাঠক এসেছিল। বহুলোক এসেছিল। মনে হয়, জন্মাষ্টমী উৎসব উপলক্ষ্যে সেই সভা। অনেক স্কুলের ছাত্র এসেছিল। সেখানে নিমাই সন্ন্যাস গান হচ্ছিল। আমাকে একজন নিয়ে গেল। আমি চুপ করে বসে গেলাম, কাউকে কিছু না বলে। যেখানে দর্শকরা বসে, সেখানে গিয়ে বসেছি। গীতাপাঠ হচ্ছিল। এক পণ্ডিত গীতা পাঠ করছিল। সে বলছিল, প্রত্যেকের গীতা পাঠ করা দরকার। তাহলে আর কোন সংশয় থাকে না। এতে ভগবৎ প্রেম হয় এবং তাতে আশীর্বাদ পাওয়া যায়। গীতাপাঠ করলে কুশল হয়। টুকরো টুকরো কথা বলছে। কয়েকজন জ্যোতিষী ও এসেছে। আমাকে শুধু একজন চিনতো ওখানে। কয়েকজন ব্রহ্মচারী ছিল। খুব হাত পা নেড়ে বলছে। আমাদের দেশ উচ্ছন্নে গেছে। পাপ ঘিরে ধরেছে। সবারই পাপ মন হয়ে গেছে। এক ধরণের কথা বলছে। তাদের কথা হলো, কাহারও কিছু হবে না। তোমরা শেষ হয়ে গেছ। তোমাদের নরকে ঠেলবে। তোমাদের জন্য নরকের দরজা খোলা। এই এক কথাই বোঝাচ্ছে। এরমধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করছে, ‘নরকে কি হয়?’

পণ্ডিত জিহ্বায় কামড় দিয়ে বলছে, 'জানো না? তেলের মধ্যে সিদ্ধ করে।' সাংঘাতিক কথা। আবার জিজ্ঞাসা করছে, কোন্ পাপে কি হয়?

পণ্ডিত— মানুষ মরলে এই হয়। ছাগল মরলে এই হয়, মশা মাছি মরলে এই হয়। এইগুলো খণ্ডন হয় যদি নাম টাম করে, জপ করে। এরমধ্যে আর একজন জিজ্ঞাসা করছে, ''স্বর্গেই তো আপনারা যাবেন। আপনারা তো নরকে যাবেন না?''

উঃ — না, আমরা নরকে যাব না।

প্রঃ — আপনারা যাবেন না। আমরা যাব?

উঃ — আপনারা নাম না করলে নরকে যাবেন, পরিষ্কার কথা। এরমধ্যে শ্রীরামচন্দ্রের কথা, নকুল সহদেবের কথা হল। একজন জিজ্ঞাসা করলো, এতো অনেক বছর আগের কথা। এখন কি করা দরকার, সেইটা বলুন।

উঃ — কলিযুগে নাম করেন। নাম ছাড়া গতি নাই।

প্রঃ — নাম করে কারও কিছু হয়েছে?

অনেকদিন আগের কথা তো, ভুলে যাই। কি একটা পাঠ হচ্ছিল। জোকার (উলুধ্বনি) দিচ্ছিল। কৃষ্ণেরই কথাবার্তা হচ্ছিল।

তখন একজন দাঁড়িয়ে বলছে, আমাদের দেশ রসাতলে। আমাদের দেশ উচ্ছন্নে গেছে। এখন আমাদের তৈরী হওয়া দরকার। আমরা যাতে সদাসর্বদা নাম করতে পারি, সেইভাবে তৈরী হতে হবে।

এরমধ্যে একজন বলছে, এত কথা হ'ল এই কয়েকদিন ধরে। কিন্তু আমরা যে কাজ করবো, আমাদের কি যে করতে হবে বা কিভাবে জপ আসে, তাতো বললেন না।

উঃ — কাজ করতে করতেই মন আসে।

তারপর আমাকে কিছু বলতে বললো।

আমি বলি, **আপনারা কদিন ধরে অনেক আলাপ করলেন। এটা আলাপ নয়, বিলাপ হয়ে গেছে। প্রলাপ যে বকলেন, শুধু মানুষকে ভয় দেখালেন, আতঙ্কগ্রস্ত করলেন। সত্যিকারের আশ্বাস বাণী ওরা (দর্শক ও শ্রোতাগণ) কোথায় পেল? সেই বাণীটা দেন।**

এরমধ্যে কয়েকজন আমাকে প্রণাম করেছে। ওঁরা (পণ্ডিতগণ) আমার কথা জিজ্ঞাসা করাতে আলাপ পরিচয় হল। 'আসুন, আপনি উপরে আসুন। আপনি বসুন।'

আমি উপরে গেলাম। সকলের অনুরোধে বললাম, ''বলার বিশেষ কিছু নেই। মানুষ পরিবর্ত্তনের সুরে পরিবর্ত্তিত হয়ে হয়ে যায়। মানুষ ভীত এবং ভাবগ্রস্ত হয়ে থাকতে পারে না। কয়েকদিন ধরে যে আলাপ হচ্ছে, এতে মতে মতে ভাগ হয়ে যাবে। এই আলাপের সুরে মিলনের অভাব আছে। এতে মিলতে পারবে না।''

প্রশ্ন — আজ্ঞে, কিভাবে এক হওয়া যাবে?

আমি বলি, যেকোন মহাপুরুষ, যাঁরা এখানে এসেছেন, তাঁদের মত ও পথ ক্ষুদ্র নয়। তাঁদের মত যদি ক্ষুদ্র না হয়,

পরিবেশ ক্ষুদ্র হবে কেন? তবে এক একজনের গোষ্ঠীটা ক্ষুদ্র হয়ে যাচ্ছে। কৃষ্ণের মত ও পথ অতি বড়। আজ অতি সঙ্কীর্ণতার গণ্ডীর মধ্যে তাঁর মত রেখে দেওয়া হয়েছে। সাগরের জল পাত্রে রেখে দিলে সাগরকেই ছোঁওয়া যায়। সাগরের জলের পাত্রটা বাটি। সাগর বিরাট। জলের পাত্রটা ক্ষুদ্র। সাগর যখন বিরাট, তাঁকে রাখবে বিরাটভাবে। কৃষ্ণ বিরাট, তাঁকে বিরাটেই রাখবে। এত ক্ষুদ্র পাত্রে শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণকে রাখা হয়েছে, যে, তাঁদের পূর্ণ মর্যাদা দেওয়া হচ্ছে না। মানুষ পাত্রটাকে দেখে। এতবড় নদী, তাকে যদি এতটুকু পাত্রে রেখে দেওয়া যায়, পিপাসা মেটে না। কাজেই যোগ্যতা অনুযায়ী পাত্রে রাখা উচিত।

এতদিন শাস্ত্রের যে কথা হয়েছে বা চলছে, তাতে প্রত্যেকেই ভাগ্যের উপর নির্ভর করছে। প্রত্যেকেই হতাশ হয়ে গেছে। শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ ব্যাপক ও বৃহৎ। সেই বর্ণনাকে ক্ষুদ্রভাবে আনা হয়েছে। আমাদের দেশটা ক্ষুদ্র হয়ে গেছে। বাংলাদেশেই কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মত রয়েছে। নিজেদের কর্মের গুণে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে গেছে। তারা সেই বৃহৎ চিন্তায় যায় নাই। এটাকে গভীরতার মধ্যে এনে তত্ত্বপথে আসে নাই। এতবড় আকাশে বিরাট সূর্য। সূর্য হতে লণ্ঠন অনেক ক্ষুদ্র। লণ্ঠন সূর্য ছাড়া নয়। **একটা লণ্ঠন একটা ঘরের পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু সূর্য উঠলে লণ্ঠনের প্রয়োজন হয় না। লণ্ঠনের আলো যে সূর্যেরই আলো। তবে সূর্যের যে ব্যাপ্তি আর লণ্ঠনের ব্যাপ্তি এক নয়।** লণ্ঠন যে সূর্যেরই জিনিস তা আগে বুঝতে হবে। লণ্ঠন যখন আছে, তাপ আছে, আগুন আছে, তেজ আছে। লণ্ঠনের আগুনে সর্ব জায়গা জ্বালিয়ে দেওয়া যায়। অতটুকু জায়গার মধ্যে বিরাট সত্তার জিনিসটুকু রয়েছে। লণ্ঠনকে ধরলে সূর্যের গুণ পাই।

শ্রীরামচন্দ্রের পথ, শ্রীকৃষ্ণের যে পথ, সেও বিরাটেরই পথ। ভয়ভীতিতে বা আতঙ্কের গণ্ডীতে যদি ধর্মকে রাখি, কারও মন সেদিকে যাবে না। গভীরভাবে অনুধাবন করতে হবে। আমাদের চিন্তা করতে হবে, শ্রীকৃষ্ণ কি বলেছেন, শিব কি বলেছেন, শ্রীরামচন্দ্র কি বলেছেন। তাঁরা যে সাধনা করেছেন, তাঁরা যে চিন্তা করেছেন, তাঁরা তাতে জগতের রূপ নিজেদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাঁরা সমগ্র জগৎকে যা দান করেছেন, সেটি সীমাবদ্ধ মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে সীমাবদ্ধ নয়। পাপীদের জন্য এই ব্যবস্থা, এটা গণ্ডীর কথা মনে হলেও মোটেই গণ্ডীর কথা নয়। সবকিছুর মধ্যে থেকে, সবকিছু যাহা হবে, সেগুলিকে বর্জন করে, আরও এগিয়ে যেতে হবে। তোমরা বলছো, শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, 'মায়া মোহ ত্যাগ করো। তোমরা সত্যপথে যাও। সত্যের উপাসনা কর। ভক্তির পথে যাও।'

এই যে **মায়া মোহ ত্যাগ করার কথা, ইহা দেবতার মুখে শোভনীয় নয়। দেবতার মুখে কোনদিনই কোন বাঁধুনীর কথা শোনা যাবে না। এটা কোন দেবতাই বলবেন না যে, তোমরা এখানে আটক হয়ে থাকবে।** 'উবাচ' দিয়ে যে যার যার ব্যক্তিগত চিন্তার কথা বলা হয়েছে, 'উবাচ'টা কিন্তু ভগবানের কথা নয়। পণ্ডিত উবাচ। ওসব পণ্ডিতদের কথা। ভগবান যিনি পূর্ণ সত্তায় প্রতিষ্ঠিত, 'হবে না', 'পারবে না', এরূপ নৈরাশ্যের কথা, হতাশের কথা তিনি কখনও বলবেন না। তিনি বলবেন, **'যে যে চিন্তায়ই থাক না কেন, তোমরা আকাশের দিকে, চন্দ্রের দিকে তাকিয়ে থাকবে। সর্বত্র যেখানে তাকাবে, সে যে আমারই সত্তা, আমারই চৈতন্য। আকাশ, বাতাস, মাটি সবই আমি। কাজেই তুমি আমি ছাড়া নও। আমার বুকে তুমি। আবার**

তোমার মাথার উপরে আমি। তোমার পায়ের তলায় মাটি, মাথার উপরে আকাশ।'

শ্রীকৃষ্ণকে ভক্ত বলছে, 'হে দেবতা, হে কৃষ্ণ, হে অন্তর্যামী, আমি আর ভাবতে পারবো না। যা ভাববার তুমি ভাব। আমার আর ভাবতে ইচ্ছা করে না। আমি ভাবতে পারি না।' এইভাবে 'কোথায় ভগবান আছেন? কি আছে, না আছে জানি না,' এই ভাবতে ভাবতে তার ভিতরকার সুর জেগে উঠছে। সবসময় শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায়, তাঁর ভাবে এমন আবিষ্ট হয়ে গেছে যে, তার দর্শন হতে আরম্ভ করেছে। ভক্তের মনের ভাব হল, 'হলেও (দর্শন হলেও) ঠিক, না হলেও ঠিক। এটা ভাব আর কোন চিন্তা করো না।' তাতে হয়েছে কি, সকল সময় চিন্তা করতে করতে দেবতা উঁকি ঝুঁকি দিতে আরম্ভ করেছে। দেবতা কখন এসে বলবে, তোমার দরজা খোলা, তুমি নিজেও জান না। এ যেন বাচ্চার হাত-পা ছোঁড়ার মত। বাচ্চা শিশু দৌড়াদৌড়ি করে না। এই হাত-পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে ওদের ক্ষুধাও লাগে। এই ব্যায়াম কোথা থেকে শিখলো? স্বাভাবিকভাবে এই যে ব্যায়াম, এটা নিজস্ব, আপনা আপনি চলতে থাকে। বাচ্চাদের মধ্যে যদি এটা থাকে, সেইরূপ আমাদের ভিতরও থাকে। তাতে ভগবৎ দর্শন হয়। সে রকম রীতিনীতি আছে, সেটাও আপনাআপনি চলতে পারে। তবে সেই রীতিনীতিগুলি কি? এই ব্যায়াম শিখলো কোথা থেকে? **নাচ লম্ফ ইত্যাদি যেমন কেহ শেখায়নি, দেবতার রাজত্বে প্রকৃতির পাঠশালায় এরকম ব্যায়াম সবাই করে চলেছে আপনভাবে অজান্তে।** দেখ, বাতাস হু হু করে বয়ে চলেছে। সূর্য আলো দান করে চলেছে। এগুলো যখন এরকম, আপন আপন ধারায় প্রকাশিত, তবে ভগবানকে পাবার পথ অন্যরকম হবে

কেন?

ভগবান কি এরকম পথ করেছেন যে, 'তোমরা সব পাবে। কেবল আমাকে পাবে না।' তাতো করেননি। ভগবান এমন পথ করেছেন, যাতে তাঁকে পাওয়া যায়। সব বুদ্ধি যখন ভগবান দিলেন, সৃষ্টির বুদ্ধি, শ্রবণের বুদ্ধি, স্বাদ গ্রহণের বুদ্ধি, ভোজনের বুদ্ধি, এগুলি তো কাহাকেও শিখাতে হয় না। তবে যাতে ভগবান দর্শন হয়, ভগবানকে যাতে পাওয়া যায়, সেই বুদ্ধিদানেও তিনি ফাঁকি দেন নাই। যদি কেহ মনে করে, তিনি সেই বুদ্ধি দেন নাই, তবে ভগবানকে ছোট করে দেওয়া হয়। এই সৃষ্টির এমনই মাধুর্য, কোথায় কোথায় কি থাকা দরকার, ভগবান এমন সুন্দর করে সাজিয়ে দিয়েছেন যে, গভীরভাবে চিন্তা করলে আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়। চোখের জল আছে বলেই চোখ ঠিক আছে। কাজেই স্রষ্টা যখন কোন দিকে কোন ত্রুটি রাখেন নি, তবে কি শুধু কিভাবে তাঁকে পেতে হয়, সেটা দেননি? তাতো মনে হয় না। বরং সহজে যাতে পেতে পারে, তারজন্যই এত ব্যবস্থা। নিমন্ত্রণ খাওয়াতে গেলে গাড়ীর ব্যবস্থা, ডেকরেটরের ব্যবস্থা, আরও কত কি ব্যবস্থা করতে হয়। এগুলোর যোগাযোগের প্রয়োজন কি? যাতে খাওয়া ভালভাবে হতে পারে, তার জন্যই এত যোগাযোগ। কাজেই এত যে সৃষ্টি, ডেকরেটরের ব্যবস্থা, এই যে এত সাজানো, তাঁকে যাতে বুঝতে পারে, যাতে তাঁর দর্শন হয়, তারজন্যই সবকিছু নিখুঁতভাবে সুসজ্জিত। **দেবতার কথা, দেবতার লীলা যাতে পৌঁছতে পারে তোমাদের নিকট, চারিদিকে তারই ব্যবস্থা। যাঁর সৃষ্টি এত অপরূপ, তাঁকে যাতে পায়, তারজন্যই এই সৃষ্টি।** এখন কেমন অবস্থা? বিয়ে যার সেই নেই। হয় ছেলে নেই, না হয় মেয়ে নেই। শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ, যার

শ্রাদ্ধ সে মরে নাই। সৃষ্টির এত সুব্যবস্থা ও সুবন্দোবস্ত ভগবানের সঙ্গে মোলাকাত করার জন্যই পণ্ডিতমশাই।

পণ্ডিত — তাতো বুঝতে পারি নাই। তাঁকে পাওয়ার জন্যই যে এত সুব্যবস্থা, এটা তো চিন্তা করি নাই।

আমি বলি, গোলমাল তো সেখানেই। যাঁর জন্য এত কিছু, তাঁরই নাম ভুলিয়ে দিচ্ছে।

প্রশ্ন ঃ এটা কি করে হয়?

আমি বলি, মই হল একটা উঠবার রাস্তা। মইটা ধরে ধরে ওঠে। জাহাজটা বিরাট, খেলাধুলা পর্যন্ত করে তার উপর। জাহাজে যে আছি, জাহাজ যে চলেছে, জাহাজটা সাগরের উপরে আছে, গ্রামে নেই, এটা তো ভুললে চলবে না। **পৃথিবী যে শূন্যে ঝুলছে, এটা পৃথিবীর নিজস্ব স্বরূপ নয়। পৃথিবীর যে রূপ, এটা আলাদা রূপ হতে এসেছে। যার থেকে পৃথিবী এসেছে, তার রূপ আর একটা রূপ হতে এসেছে।** আমরা বাতাস না থাকলে বাঁচতাম না, জল না থাকলে বাঁচতে পারতাম না। এগুলো না থাকলে বাঁচতাম না। অমুক না হলে, তমুক না হলে বাঁচতাম না। তাহলে আমরা কার মধ্যে আছি? আমাদের জীবনটা কার উপর নির্ভর করছে? তবে অনেকগুলোর মধ্যে আমরা আছি। অনেকগুলো কেন দিল? এইজন্য দিল যে, মইয়ের শেষ সীমানা যেটা, পথের শেষ সীমানা যেটা, সেদিকে যেন স্বাভাবিকভাবে এগিয়ে যাই। জলের গতি যেমন নীচের দিকে, তেমনই স্রোতের টানে যেন আমরা এগিয়ে চলি।

ট্রেনটা যখন যায়, ট্রেনের কি নৌকার মত হাল আছে?

এটা যদি কাতিয়ে কাতিয়ে (এদিক ওদিক করে করে) চলতো, তাহলে ঘরবাড়ী থাকতো? ট্রেন লাইনের প্যাঁচে পড়ে গেছে। ট্রেনের লাইন দুইটা ওর মধ্যে আটকানো। কাজেই ট্রেন লাইনে লাইনে চলছে। ওর নিজস্ব গতিতে নেই। রাস্তার গতিই এরকম। আমরা স্বাভাবিকভাবে চলেছি। এটাই প্রকৃতির নিয়ম। প্রকৃতির নিয়ম হলো একসময় না একসময়ে যাবেই একদিন। তাহলে যদি বলে, 'আমরা কিছু করবো না, কিছু বলবো না'। কি করবে না? যে লোক ৫ সের ১০ সের ওজন বইতে পারে, বুক ডন দিয়ে সে আরও ভারী নিতে পারে। লাবড়াতে আলু, কুমড়া, কপিপাতা, বেগুণ কত কি লাগে। তোমাকে জিজ্ঞাসা করা হল, 'নিমন্ত্রণে কি খেয়েছ?' বললে, 'লাবড়া খেয়েছি।' তখন কি পাঁচরকম তরকারি, বা লঙ্কা, জিরা, হ্যান ত্যান খেয়েছ, বলবে? এগুলো যেমন একটা কথার দ্বারা বুঝানো হয়, আমাদের পথও সেই ধারাতে চলেছে। সহজভাবে সেই পথ তৈরী করছি। বহু বস্তু যখন সম্মুখে আছে, এগুলোর পরিচয় কিসের জন্য? এই বাস্তব জগতে যতগুলি রূপ, যতগুলি গুণ, যতগুলি প্রকাশ, যা কিছু দেখতে পাচ্ছ, প্রত্যেকটির মধ্যে প্রাণ আছে। তোমারই রূপ হলেও দেখছো যে রূপটা, সেটা যে তোমা হতে ভিন্ন, তা আগে বুঝ।

এতগুলি রূপ কেন? **যাতে তুমি আমার (প্রকৃতির) পথের পথিক হও, যাতে তুমি এই পথে আরও বেশী দ্রুতগতিতে কাজ করতে পার, যাতে আরও দ্রুতগতিতে তাঁর কাছে পৌঁছাতে পার, এরজন্যই এই ব্যবস্থা।** এরচেয়ে সহজ আর কিছু নেই। এই যে এত সুন্দর রূপ সামনে রয়েছে, বিশ্বের সবকিছু যখন রয়েছে আমাদের সম্মুখে, তবে এর চেয়ে

সহজভাবে পাবার আর কি থাকতে পারে? আমরা অল্পতেই পেয়ে যাচ্ছি।

পণ্ডিত বলছে, তাহলে তো সবারই হবে। কারও পাপ থাকবে না।

আমি বলি, হ্যাঁ, এটাই দেবতার কথা। স্কুলের বোর্ড ঠাকুর্দার আমল থেকে চলেছে। সেই বোর্ড তো নষ্ট হয়নি। সেইরূপ আমাদের জীবনের এই বোর্ডে, এই শ্লেটে, এই দেহক্ষেত্রে এহেন পাপ নেই, যা কেউ না কেউ না করেছে। আবার যদি পুঁছে দিই, রোগ আক্রমণ করবে। এটাই নিয়ম। আবার রোগ অপসারণ করতে হবে, বিধি অনুযায়ী। **জীবনে অনেক ঘটনা আসে, অনেক কিছু আসে, তা থাকে না। যদি থাকতো তবে আর কেহ কিছু করতে পারতো না। যদি মেঘগুলি সারাক্ষণ এমনি ঢেকে থাকতো, তাহলে সূর্যের মুখ আর কেহ দেখতে পেতো না।** মাঝে মাঝে মনে হয়, মেঘটাই বড়ো। সূর্যকে আড়াল করে রয়েছে বলেই কি সূর্য হতে মেঘ বড়? মেঘ সূর্য হতেই সৃষ্টি। এই মেঘ বা কলঙ্ক যদি না থাকতো, তাহলে এত সুন্দর সৃষ্টি হবে কি করে? আমাদের মধ্যে পাপ বা পঙ্কিলতা, এটা আমাদেরই সৃষ্টি। সৃষ্টির মূলেই ক্লেদ, সৃষ্টির মূলেই অসার। যত মাছের পিত্তি দেয় গাছের গোড়ায়, যত নর্দমার জল গাছের গোড়ায়। তার কারণ সৃষ্টির মূলেই ক্লেদ। **সৃষ্টির মূলেই যত ক্লেদ পাচ্ছ। সুতরাং মুলটাই যখন ক্লেদ, ক্লেদের জায়গায় ক্লেদের বুলিই আসবে। সেখানে অন্য কোন ভাষা আসবে না। যারা ধাঙরের কাজ করে, তারা কি ক্ষীরের বালতি নিয়ে চলবে? কিন্তু যত আবর্জনা বিষ্ঠা নিয়ে ফেলছে, এগুলো হতেই সার সৃষ্টি হয়। ক্লেদ পঙ্কিলতা আর থাকে না। সাগরে পানা কি স্থান পায়?**

আপনারা (পণ্ডিতগণ) যে ক্লেদের কথা বললেন, এটা আমাদের দেশের ডোবার কথা। কচুরীপানা খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে স্রোতের জলে ফেলে দিলে আর অস্তিত্ব থাকে না। কাজেই পানা বা পঙ্কিলতা, যা বলা হয়, তাকে যদি ডোবার মধ্যে আটকিয়ে রাখা হয়, তবে বাড়তে থাকে। পানা নিজেও ছোটাছুটি করতে চায়। ওরা এক জায়গায় থাকতে চায় না। **পাপ, পঙ্কিলতা, ক্লেদ, তারাও বলছে, 'আমরা মুক্ত'। তারাও এক জায়গায় থাকতে চায় না। নর্দমার গন্ধও বলছে, 'আমি মুক্ত।' রাস্তার ধুলা, বালি, কফ ঘুরছে মুক্ত জায়গায়। এতে পবিত্রতার সঙ্গে মিশে সবাই পবিত্র হয়ে যাচ্ছে।** নর্দমার জল গন্ধ হয়ে উপরে উঠে যায়। গণ্ডীতে আর থাকতে চায় না। কোন জিনিসই থাকে না। সবাই মুক্ত জায়গায় যেতে চায়।

আমরা কত জীব হত্যা করে চলেছি। আমাদের জীবনে কত পিঁপড়া, মশা, মাছি মারছি। ওটার যদি হিসাব থাকতো, তাহলে তো কারও দেবদর্শন হতো না। কে না মশা, মাছি, ছারপোকা মেরেছে? একজন একটা প্রজাপতির পিছনে খোঁচা দিয়েছিল। সেজন্য সে অন্ধ হয়ে থাকলো। তাহলে তো সবাইকেই অন্ধ হয়ে থাকতে হয়। একটা প্রজাপতি, একটা হরিণ মেরেই যদি এই হয়, তবে কারও আর কিছু হবে না। জীবনের ব্যথা শ্লেট পেন্সিলের মতো মুছে ফেলে দাও। আকাশে মেঘ হয়, সেই মেঘ আবার মুছে যায়। মেঘের জল নিংড়ে ফেলে দিল। মেঘ চলে গেল। মেঘের অন্ধকার আলোরই আভাষ। **সমস্ত পাপ, পঙ্কিলতাগুলি মহা, বিরাট সৃষ্টিরই একটা বিশেষ রূপ। নর্দমার জল অনন্ত জীবের খাদ্যের বিষয়বস্তু।** জীবজগতের সব খাদ্য তো সবাই খায় না। গাছ যেটা খায়, তুমি তো তা খেতে পার

না। বিড়াল যেটা খায়, তুমি তো তা খেতে পার না। শকুনি যেটা খায়, তুমি তা খেতে পার না। কাজেই প্রত্যেকের জীবনের যাত্রাপথ, সবটা নিয়েই সব।

আমি সবাইকে (দর্শকমণ্ডলীকে) বললাম, তোমরা কেউ ভেব না। পাপ বুদ্ধি আসছে, চলে যাচ্ছে। পাপ মেঘের ন্যায় বা ধুঁয়ার মত বিচরণ করছে। অন্ধকার হচ্ছে। এই অন্ধকারের জন্য ভয় পেয়ো না। **পাপ, পঙ্কিলতায় যারা থাকে, অপরাধ যারা করে, মেঘের মধ্যে যারা আছে, তাদের কি সূর্যের দর্শন হয় না?**

হ্যাঁ হয়। পাপ যারা করে, তারাও মুক্তির স্বাদ গ্রহণ করে। সেইরূপ পুণ্য হতেও পাপের সৃষ্টি হয়। এটা কি রকম? পুণ্যাত্মা ব্যক্তি ধার্মিক ব্যক্তি পুণ্য কাজ করে, মানুষের মনে বিশ্বাস অর্জন করে, পাপ কাজ করতে শুরু করলো। মানুষকে প্রতাড়িত করতে তার সুবিধা হয়ে গেল, এমনও দেখা গেছে।

এক ব্যক্তির তেষ্টা পেয়েছে; 'যাও সাগরে গিয়ে তৃষ্ণা মিটাও।' সাগরে গিয়ে তেষ্টা মেটে না। তেষ্টাতো মেটে না এতে। 'বরফের দেশে যাও।' গেল বরফের দেশে। জল ঠাণ্ডা হয়ে জমে আছে, গলছে না। এদিকে তেষ্টায় মরে যাচ্ছে। তেষ্টা মিটছে না। তবে উপায়? সাগর বা বরফ কাছে পেয়েও তো কাজ হল না। তবে উপায়? তখন বলছে, খনন করো। খুঁড়তে খুঁড়তে ১০/১৫ হাত পরেই হু হু করে জল পেল। তাতেই তেষ্টা মিটলো। পায়ের তলায় খুঁজে সাগর পেল। পায়ের তলায় খনন করে খোঁজ। দেবতা থাকে নর্দমায়, দেবতা থাকে পায়ের তলায়। তোমার পায়ের তলায় এতবড় সাগর রয়েছে, তোমার তেষ্টা মিটছে না? সাগরের জল বা বরফে তেষ্টা মেটে না। তেষ্টা মেটে পায়ের

তলার জলে। সেই মেটানোর বস্তু অন্য কোথাও নয়, **তোমার মধ্যে যে পঙ্কিলতা, তার আড়ালেই বসে রয়েছে দেবতা। আড়ালের মধ্যে যখন দেবতা রয়েছে, পাপ পঙ্কিলতা, ক্লেদ তার নিবাস হয়ে রয়েছে।** বিরাট যে রয়েছে তোমার মধ্যে, তার সাড়া দিচ্ছে, আভাষ দিচ্ছে।

তোমার মধ্যে যে পঙ্কিলতা, তার মধ্যেই তেজ। আড়ালে বিরাট সূর্যের তেজ রয়েছে। আলোই হচ্ছে দেবতার আভাষ। যদি বোঝ পঙ্কিলতা রয়েছে, জাগতিক রূপে নানারকম আবিলতা, ঝঞ্ঝাট রয়েছে, তার আড়ালে বিরাট সূর্য, সেই আভাষ। তোমরা যদি খুঁজে দেখ, যদি নিজস্ব সত্তার সঙ্গে যোগাযোগ কর, তবে আভাষের যে ইঙ্গিত, যে পূর্বাভাষ পাবে, এই আভাষ পঙ্কিলতার আড়ালে রয়েছে। নর্দমার জল খাদ্যরূপে পরিণত হয়। সব ময়লা নিয়ে কপি ক্ষেতে দিচ্ছে। তাহলে আমরা কি খাচ্ছি? কপির রূপ নর্দমায়, কপির রূপ বিষ্ঠায়। অসারের মধ্যে সব সার। অনন্ত জগৎময় যে অসার বলে, এর মধ্যেই অনন্ত সার, অনন্ত সুর রয়েছে।

আজ এই থাক। রাম নারায়ণ রাম।

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

-ঃ প্রাপ্তিস্থান ঃ-

১) কৃষ্ণা, S.T.D. বুথ, বি-২ বাজার, M.A.M.C. দুর্গাপুর - ১০
ফোন - ০৩৪৩-৫৫৬০১২৯
২) রাম নারায়ণ রাম ভবন, রেখা মিত্র, ৪৭ নতুন পল্লী, বর্ধমান
৩) বীরেন্দ্র দর্শন, জয়ন্ত দে, আহেরী টোলা ষ্ট্রীট, কোল-৫, ফোন- ২৫৩০-৪৮০৭
৪) সৌরীন্দ্র নাথ বাগচি, দক্ষিণেশ্বর, কোলকাতা - ৭৬, ফোন - ২৫৬৪-২৪৪১
৫) বিনয় মোদক, মধ্যমগ্রাম, কোল - ১৩০, ফোন - ২৫৩৭-১৫৯৩
৬) গৌর মুখার্জী, ১১/৫, পর্ণশ্রী, বেহালা, ফোন - ২৪৪৫-৯২২০
৭) শৈবাল ঘোষ, সালকিয়া, হাওড়া, ফোন - ৯২৩১৫৪২৯৯৫
৮) কোলকাতা বইমেলা।
৯) জলধর সাহা, সেক্রেটারী সন্তান দল, মেঘালয়, মোঃ- ৯৪৩৬১১২৬০১
১০) বলরাম, ৩৪ এস.কে. দেব রোড, কোল - ৭০০০৪৮, মোঃ- ৯৮৩৬৬৯৯৪৪৮
১১) Lakshindhar Das, Balasor, Orrisa, Phone : 92387-10622
১২) বেদপ্রজ্ঞা মহিলা সংগঠন, লেকটাউন, কোলকাতা, ফোন - ২৫৩৪-৬১৩৬
১৩) সুভাষ ঘোষ, বিলাসীপাড়া, আসাম, ফোন - ০৩৬৬৭-২৫১১৭৯
১৪) বাপি অধিকারী — কোটাল হাট বর্ধমান, ফোন - ৯২৩২৬৮৪২৫৯
১৫) উত্তম চ্যাটার্জী — নিয়ামতপুর, আসানসোল, ফোন - ০৩৪১-২৫১৫০৬৬
১৬) মধুসূদন মৈত্র পুরুলিয়া, ফোন - ০৯৮৩১৬১১৬৮৪
১৭) দেবু (নেতাজী দেবু) গড়িয়া, কোলকাতা, ফোন - ৯০০৭০৭৫১৯৯
১৮) আইডিয়াল বুক হাউস, কলেজ স্কোয়ার, কোলকাতা - ৭০০০০৯
১৯) তরুন/ইরা জোয়ারদার, বাবুপাড়া, জলপাইগুড়ি, ০৩৫৬১-২২৪৫১৯
২০) রমা নাথ মহন্ত, বালুরঘাট, দঃ দিনাজপুর, মোঃ- ০৯৭৩৩৩৩৯৪৩২
২১) বালক ব্রহ্মচারী যোগ মন্দির, লিলুয়া, হাওড়া, ফোন - ৯২৩০৯১৩৬৫৫
২২) ভোলানাথ দাস, কালনা গেট, বর্ধমান, ফোন - ৯৪৭৪৬৯৫৬৫৪
২৩) তপন / অনিমা গাঙ্গুলী, মানকুন্ডু, হুগলী, ফোন - ২৬৮৫-৬১৪৬
২৪) কালিপদ চক্রবর্ত্তী, পাখানজোড়, ছত্রিশগড়, মোঃ- ৯৪০৬০০১৫৭২
২৫) গনেশ রায়, ফালাকাটা, জলপাইগুড়ি, মোঃ- ৯৭৪৯০৯০১৮২
২৬) বেদ অভেদ ধাম, হরে কৃষ্ণ, আলিপুরদুয়ার জং, মোঃ- ৯৪৩৪২০৪৫৯০
২৭) ইতি বর্মন, দিনহাটা, কোচবিহার, মোঃ- ৯৯৩২৬৩৯৬৩৯
২৮) নিহার / অচিন, বালুরঘাট, দঃ দিনাজপুর, মোঃ- ৯৪৭৪১৪০২৫২
২৯) আর.এন.আর এন্টারপ্রাইজ, ফোন - ২৪৪০-৯১৫১
৩০) ডঃ সুধাংশু দত্ত, মালিগাঁও, গুয়াহাটি, আসাম, ফোন - ০৯৪৩৫১৯০৭৮১
৩১) রাম নারায়ণ রাম ভবন, ১, সারদাপল্লি, শেওড়াফুলি, মোঃ- ৮১০০৪৩৯৯১১
৩২) ভগীরথ সাহা (ভগু), গোয়ালাপট্টি, কোচবিহার, মোঃ- ০৯২৩৩২৩৭৬৬৬
৩৩) বেদধাম, ইছাপুর, উঃ ২৪-পরগণা, মোঃ- ০৯৪৩৩৯৫৯১৩৮

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-
অভিনব দর্শন প্রকাশনের প্রকাশিত পুস্তক সমূহ

	পুস্তক পরিচিতি	প্রকাশকাল
১)	বালক ব্রহ্মচারী ট্রাষ্টের নিবেদন	শুভ মহালয়া, ১৪১১
২)	মৃত্যুর পর	শুভ মহালয়া, ১৪১১
৩)	পরপারের কান্ডারী	শুভ বড়দিন, ১৪১১
৪)	সাম্যের প্রতীক শিবশম্ভু	শুভ শিবরাত্রি, ১৪১১
৫)	অঙ্গীকার	শুভ ১লা বৈশাখ, ১৪১২
৬)	১৬ মাত্রায় নির্বিকল্প সমাধি	শুভ ১০ই আষাঢ়, ১৪১২
৭)	বীজ ও মহাসৃষ্টি	শুভ মহালয়া, ১৪১২
৮)	শুভ উৎসব	শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১২
৯)	তত্ত্বসিন্ধু	শুভ মাঘী পূর্ণিমা, ১৪১২
১০)	দেহী বিদেহী	শুভ নববর্ষ, ১৪১৩
১১)	পথপ্রদর্শক	শুভ ১০ই আষাঢ়, ১৪১৩
১২)	অমৃতের স্বাদ	শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১৩
১৩)	বৈদিক বিপ্লব	শুভ মাঘী পূর্ণিমা, ১৪১৩
১৪)	সুরের সাগরে	শুভ ১লা বৈশাখ, ১৪১৪
১৫)	পথের পাথেয়	শুভ উপনয়ন দিবস, ১৪১৪
১৬)	জন্ম মৃত্যু রহস্য	শুভ মহালয়া, ১৪১৪
১৭)	মহাশূন্য মহাচেতনার সাগর	শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১৪
১৮)	আলোর বার্তা	শুভ মাঘী পূর্ণিমা, ১৪১৪
১৯)	কেন এই সৃষ্টি	শুভ ১লা বৈশাখ, ১৪১৫
২০)	জন্মসিদ্ধ মহানের নির্দেশ	শুভ উপনয়ন দিবস, ১৪১৫
২১)	তত্ত্বদর্শন	শুভ মহালয়া, ১৪১৫
২২)	মহামন্ত্র মহানাম	শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১৫
২৩)	পাত্র ও মাত্রাজ্ঞান	শুভ মাঘী পূর্ণিমা, ১৪১৫
২৪)	চেতনা ও মহাচৈতন্য	শুভ ১লা বৈশাখ, ১৪১৬
২৫)	মনই সৃষ্টির উৎস	শুভ উপনয়ন দিবস, ১৪১৬
২৬)	সাধু হও সাবধান	শুভ মহালয়া, ১৪১৬
২৭)	লং পাহাড়ের ডায়েরী	শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১৬
২৮)	বাস্তব ও অধ্যাত্মবাদ	শুভ ২৫শে ডিসেম্বর, ২০০৯
২৯)	যত্র জীব তত্র শিব	শুভ শিবরাত্রি, ১৪১৬
৩০)	ম্যাসেঞ্জার	শুভ ১লা বৈশাখ, ১৪১৭
৩১)	আলোর পথিক	শুভ উপনয়ন দিবস, ১৪১৭
৩২)	নাদ ব্রহ্ম	শুভ রাখী পূর্ণিমা, ১৪১৭
৩৩)	বিপ্লব দীর্ঘজীবি হউক	শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১৭
৩৪)	চিন্তন	শুভ ২৫শে ডিসেম্বর, ২০১০
৩৫)	মহা জাগরণ	শুভ শিবরাত্রি, ১৪১৭
৩৬)	পাপ পুণ্য	শুভ ১লা বৈশাখ, ১৪১৮

'বেদপ্রজ্ঞা কমিউনিকেসন' এর নিবেদন ঃ-

১)	পরমপিতা (ভিডিও সিডি, Vol. 1)	শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১৩
২)	পরমপিতা (ভিডিও সিডি, Vol. 2)	শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১৪
৩)	পরমপিতা (ভিডিও সিডি, Vol. 3)	শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১৫